ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

আনিসুল হক

ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

SUVOM

আনিসুল হক

A_R

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

© | পদ্য পারমিতা

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ৬০ টাকা

Falgooner Rater Andhare | By Anisul Hoq
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Dhruba Eash
Price : Tk 60 only
ISBN : 984-8160-61-2

মঈনুল আহসান সাবের
অগ্রজপ্রতিমেষু

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

অন্ধকারের একশ বছর
খেয়া
ফাঁদ
বৃষ্টিবন্ধু
আয়েশামঙ্গল
ভালোবাসা, আমি তোমার জন্যে কাঁদছি
বেকারত্বের দিনগুলিতে প্রেম
নিধুয়া পাথার
আমার একটা দুঃখ আছে

এই বইয়ের সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক।
রচনাকালে আইনগত পরামর্শ নেওয়া হয়েছে
এডভোকেট এস এম কাইউমের কাছ থেকে।

কায়সুল ইসলাম চৌধুরীকে লোকে ডাকে প্রফেসর সাব বলে। প্রথমদিকে সে খুব লজ্জা পেতো, সংকোচে তার ভরাট গাল, নিয়মিত শেভ করার ফলে যেখানে নীলচে আভা, লাল হয়ে যেতো। কারণ কায়সুল ইসলাম চৌধুরী জানে যে, সে শঠিবাড়ি (বেসরকারি) কলেজের একজন লেকচারার মাত্র, প্রফেসর পদবিটা তার নাগালের বেশ বাইরে।

তবু সকালবেলা, মর্নিংওয়াকে বের হলে, দুধের বড়ো ভাণ্ড সাইকেলের পেছনে নিয়ে টালমাটাল ভঙ্গিতে চলে যে দুধওয়ালা, তার সালাম তাকে পেতে হয়, সালামালেকুম, প্রফেসর সাব, ক্যামন আছেন। তখন সালামের উত্তর তো তাকে দিতেই হয় যে, ওয়ালাইকুম আসসালাম, এই দিন যাচ্ছে আর কী!

আর আশপাশের বাড়িতে যতো বিয়ে-শাদী হয় সেসবের প্রতিটার আমন্ত্রণপত্র তার নামে আসেই, সবগুলোতেই খামের ওপর তার নামের আগে জনাব/জনাবা প্রফেসর লেখা থাকে!

কায়সুল প্রতিবাদ করতে পারে না। কেবল গণ্ডদেশে ছড়ানো রক্তিমাভা কিছুটা অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদের লক্ষণ দেখায়।

তার সদ্য বানানো বাসাটা— নিচের ৫ ইঞ্চি দেয়ালের ওপরে ঢেউটিন, মেঝে এখনো কাঁচা— প্রফেসর সাহেবের বাসা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে দেখে, কায়সুল তাড়াতাড়ি বাজারের সাইনবোর্ড লেখার দোকান চিত্রবিতানে যায়। 'সালামালেকুম ছার, আপনের জন্যে কী করবার পারি' বলে আর্টিস্ট একটা টুল এগিয়ে দেয়।

যাক একটা লোক অন্তত তাকে প্রফেসর বলছে না, ভেবে যখন কায়সুল স্বস্তির একটা সুবাতাস শরীরে অনুভব করে তখনই চিত্রবিতানের আর্টিস্ট— তার এলোমেলো লাল চুল, চোখও লাল, গায়ের রং কালো, গায়ে নীল আকাশী ফুল হাতা শার্ট, হাতা গোটানো, এবং শার্টের মধ্যে নানা রঙের ছোপ, দাঁতে পানের দাগ, পরনে লুঙ্গি— চিৎকার করে ওঠে, ফুলমিয়া ও ফুলমিয়া, এক কাপ চা, এক পাইলট, প্রফেসর সাবক দুধ-চিনি দিয়া দ্যান দেখি।

প্রফেসর! হতোদ্যম কায়সুল বলে, আর্টিস্ট সাহেব, একটা কাজ করে দিতে হয় যে।

আর্টিস্ট সাহেব! আমাকে আর্টিস্ট কইতেছেন! আরে আর্ট মিস্তিরি কন! তো কন তো, কী কাম আপনার লাগিয়া করিবার পারি।

একটা ছোট্ট সাইনবোর্ড এঁকে দিতে হয়। ছায়াকুঞ্জ। ব্যাস। এতোটুকুই লেখা থাকবে। আমার বাসার গেটে লাগাবো।

তখন আর্টিস্ট পরামর্শ দেয় যে, ছায়াকুঞ্জের নিচে 'প্রফেসর পাড়া' কথাটা লাগিয়ে দিন, পাড়াটার নাম 'প্রফেসর পাড়া' হিসেবেই দাঁড়িয়ে যাবে।

কায়সুল এই পরামর্শের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলে, না শুধু ছায়াকুঞ্জই লিখে দ্যান। বাইন্ডিং করা একটা খাতায় ছায়াকুঞ্জ বানানটা নির্ভুলভাবে লিখে দিয়ে আসে কায়সুল।

এখন বেশ শোভা পাচ্ছে তার বাসার গেটের ওপর 'ছায়াকুঞ্জ' লেখা সাইনবোর্ডটা। তবে বাসাটা এখনও মোটেও ছায়াময় নয়।

রেজিনা, তার স্ত্রী, এই নিয়ে হাসাহাসি করে। বলে, ও মাস্টার সাহেব, বাড়ির নাম ছায়াকুঞ্জ ক্যান, বাড়িতে তো একটাও গাছ নাই। নিশ্চয় তোমার কোনো ছাত্রীর নাম ছায়া।

শুনে, তার শ্যালিকা, সাবিনা বেগম (১৮) বলে, দুলাভাই, বুবু কী কলো, মুখের উপর জবাব দিয়া দ্যান। কন বলে, এই ছায়া হলো তোমার পেটিকোট।

কায়সুলের গণ্ডদেশ আবার লাল হয়। শালিদের শালীনতা কি থাকতেই নেই! আর রসিকতা কি আদিরস ছাড়া হয় না!

তখন তার চোখে পড়ে যে, আঙিনায় তারের ওপর মেয়েদের নানা রঙিন কাপড় শুকুতে দেয়া, সেখানে একটা লাল পেটিকোটও আছে!

সাবিনা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, পরীক্ষা শেষের অবকাশ যাপনের জন্য এসেছে বুবুর বাড়ি, দুলাভাই নিজেই বাসাবাড়ি করেছেন শঠিবাড়িতে, বুবু প্রায়ই চিঠি লেখে— স্নেহের বোন সাবি, তাড়াতাড়ি বেড়াতে আসিও। তো এইবার আসা হলো।

শঠিবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে নেমে, রিকশাঅলাকে বলো যে প্রফেসর সাহেবের বাসা, আর কী, রিকশাঅলা সোজা এলো এই ছায়াকুঞ্জে। ফলে, এরকম একটা বিপজ্জনক বয়সের মেয়ে একা বাসে করে চলে এলো এতোটা পথ, অসুবিধা হলো নাতো! কিন্তু বাসা খুঁজে পাওয়ার সহজ কৌশলটি সাবিনা যখন বলেই ফেলছিল আর কি— ঠিকই কছো বুবু, বাসস্ট্যান্ডে নাম্যা খালি কও বলে প্রফেসর সাহেবের...তখন তার বুবু চোখ টিপে পায়ের মধ্যে পা ঠুকে তাকে নিবৃত্ত করে। পরে বুবুর কাছে সে জানতে পেরেছে ব্যাপারটা— তোর দুলাভাই লেকচারারকে প্রফেসর কওয়াটা লাইক করে না রে।

তো শুনে ভারি মজা পায় সাবিনা বেগম। এক : তার দুলাভাই নিজেকে প্রফেসর ডাকাটা পছন্দ করে না। দুই : তার বুবু পছন্দ শব্দটার বদলে লাইক করা শব্দটা ব্যবহার করে।

রাত থেকেই একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ খোসা ছাড়া লিচুর মতো। নতুন টিনের চালে বৃষ্টিধারা একটানা ঝিঁঝির ডাকের মতো শব্দ তুলেছে। কায়সুল রোজ ভোরবেলা বিছানা ছাড়ে, মর্নিংওয়াকে যাওয়া তার নিত্যদিনের অভ্যাস। আজ ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেছে। বারান্দায় বেরিয়ে কায়সুলের খানিকটা অপ্রস্তুত লাগে। কারণ বৃষ্টির কারণে সে স্বাভাবিকভাবে চলতে-ফিরতে পারছে না। এখন তার যাওয়ার কথা ল্যাট্রিনে। কিন্তু সেটা ঘর থেকে খানিকটা দূরে, ফলে তাকে এখন ছাতা খুঁজতে যেতে হবে। টিউবওয়েলের পাড়টাও খানিকটা দূরে, চোখ-মুখ ধুতে হলে সেখানে যেতে হবে। আবার মেলো ছাতা। ছা...তা।

ধুর ছাতা। আচ্ছা, মানুষ বিরক্তি প্রকাশ করতে ছাতা বলে কেন! তখন কায়সুলের মনে হয় যে, এই ছাতা হলো ছত্রাক। ফাংগাস। পাউরুটিতে ছাতা পড়ে, কাপড় চোপড়ে ছাতা পড়ে, ছাতাতেও ছাতা পড়ে। ছাতা পড়লে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। তাই মানুষ বিরক্তি প্রকাশ করতে বলেই ফেলে, ধুত্তুরি ছাতা। এই ছাতার সঙ্গে আমব্রেলার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে মজার ব্যাপার হলো, ব্যাঙের ছাতা থেকে মানুষ তার ছত্রের নাম ছাতা রেখেছে। বাংলায় এম.এ পাস (রাজশাহী ইউনিভার্সিটি) কায়সুলের মাথায় একটা কাহিনীকাব্য উঁকি দেয়— রবীন্দ্রনাথের জুতো আবিষ্কারের মতো সেও কি একটা কবিতা লিখে ফেলবে নাকি— ছাতা আবিষ্কার।

সে শুনতে পায়, বাসার পেছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকছে— ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। এই ডোবাটাও কায়সুলই খুঁড়িয়েছে, নিজের ভিটাটুকুকে উঁচু করার জন্যে। তাতে তার পোষ্য বেশ কিছু সোচ্চার ব্যাঙও জুটেছে তাহলে। ব্যাঙগুলো কোন ছন্দে ডাকছে। ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। ঘ্যাঁ ঘোঁ, ঘ্যাঁ ঘোঁ। এটা মনে হয় মাত্রাবৃত্ত! কায়সুল ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

আজ মনে হয় আর আমগাছের ডালকে দাঁতন বানানো হলো না। টুথব্রাশটাই বের করতে হবে। টুথব্রাশ আর টুথপেস্ট ব্যবহার করার বাবুয়ানাটা কায়সুল শিখেছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির জোহা হলে ওঠার পর। সবাই ব্রাশ-পেস্ট ব্যবহার করে। অগত্যা তাকেও ধরতে হলো। তিব্বত ব্রান্ডের। প্রথম প্রথম খুব দাঁত দিয়ে, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়তো। তারপর রপ্ত হয়ে গেলো। জানালায় তার টুথব্রাশ, পেস্ট থাকে। কায়সুল সহজেই খুঁজে পায়। কিন্তু পেস্ট শেষ হয়ে গেছে। টিউবটা পড়ে আছে দোমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থায়। এটার সঙ্গে যুদ্ধ করে সে কিছু মাত্র উন্নতি করতে পারবে বলে তার মনে হয় না। একটু লবণ আর সর্ষের তেল হলে আজ সকালের দাঁত মাজার কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন করা যেতো। লবণ-তেল মনে হয় রান্না-ঘরে। সেটাও এখান থেকে খানিক দূরে। রান্না ঘরটা কাঁচা। ওপরে এসবেস্টেসের ছাউনি। দু'পাল্লার দরজা। নিচের চৌকাঠে শেকল। সেখানে একটা ছোট্ট টিপ তালা ঝুলছে।

রেজিনা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। রাতের বেলা বৃষ্টি শুরু হওয়ায় যখন তারা শীত শীত অনুভব করছিল, তখন খানিক ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এখন মেয়েটা আরামে ঘুমুচ্ছে, ঘুমাক। পাশের ঘরে সাবিনা। তার অল্প বয়স। অল্প বয়সের মেয়েদের ঘুম বেশি হয়। কেন হয়, এটা অবশ্য কায়সুল জানে না।

দুটো জাতনিমের গাছ লাগিয়েছে কায়সুল। নিম যে দুই প্রকার, জাতনিম আর ঘোড়া নিম— এটা সে জানে। ঘোড়া নিমের গোটা গোটা সবুজ ফল হয়। জাতনিমের হয় না। দাঁতন বানাতে হয় জাতনিমের ডাল দিয়ে। ১২ বছর কেউ যদি অবিরত রোজ সকালে জাতনিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজে তবে তাকে বিষধর সাপে কাটলেও সে মরে না। তার শরীরে সাপের বিষ ক্রিয়া করে না। আর নিমগাছের ছায়াও নাকি বেশ উপকারী।

আমাদের কবিতায় নিমগাছের বন্দনা নেই কেন। বনফুলের একটা ছোট্ট চমৎকার গল্প অবশ্য আছে নিমগাছ নিয়ে!

দুলাভাই, একলা একলা বারান্দায় কী করেন! কবিতা লেখবেন নাকি ? সাবিনার কথায়

পেছন ফিরে তাকায় কায়সুল।

কায়সুল চুপ করে থাকে। এ ধরনের প্রশ্নের জবাব হয় না।

রাতে ঘুম ভালো হয়েছে তো সাবি। ভয়-টয় পাওনি তো একা একা ?

না। ভয় কিসের।

তা ঠিক। বলছিলাম নতুন জায়গা।

ভয়-ডর পাই নাই। কিন্তু আপনেদের ঘরে রাতে মনে হয় ইঁদুর-বিড়াল ফাইট হইছে। খুব ধুপধাপ শব্দ পালাম।

কায়সুলের গণ্ডদেশ রক্তিমাভ হয়। শালিদের শালীনতাবোধ যে কবে জাগ্রত হবে!

বুবু ওঠে নাই! রাতে বুঝি ঘুমাবার দ্যান নাই!

যাও। তোমার বুবুকে ডাকো।

সাবিনা ভেতরে যায়। কায়সুলের মনে হয়, মেয়েটাকে সাবি না ডেকে বিনা ডাকলেই তো হয়। বীণা। তার বর নিশ্চয় ডাকবে। যেমন রেজিনাকে সে মাঝে মাঝে আহ্লাদ করে ডাকে জিনু বলে।

বৃষ্টিটা একটু কমে এলো। আকাশও একটু ফর্সা হয়ে আসছে। এক জোড়া স্পঞ্জ পরে আঙিনায় নামে কায়সুল। বেশ কাদা হয়েছে। সাবধানে পা ফেলা দরকার। বেকায়দায় পা ফেলে যদি সে পিছলে পড়ে, তবে তা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার হবে। তার শ্যালিকা যে হাসিটা দেবে, তাতে বিজলি চমকানোর চেয়েও শব্দ আর আলো হবে বশি।

রান্নাঘরের বেড়ায় কয়লা গোঁজা আছে। রেজিনা কয়লা দিয়েই দাঁত মাজে। কায়সুল একটা কয়লা নেয়। ওরা অবশ্য কয়লাকে বলে আংরা। অঙ্গার থেকে আংরা। অঙ্গার শব্দটাকে মহিমান্বিত করে রেখেছেন আব্দুল জব্বার। কায়সুলের প্রিয় শিল্পী। তার টু-ব্যান্ড রেডিওতে মাঝে-মধ্যে যখন এই গানটা বেজে ওঠে, তখন নীরব ও উৎকর্ণ হয়ে শোনে কায়সুল। এরচেয়ে না হয় অঙ্গার করে দাও, সেই তো ভালো, সে অনেক ভালো। কয়লা দিয়ে দাঁত মেজে টিউবওয়েলের পানিতে মুখ ধুতে যায় কায়সুল। হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে বোঝে পানি নেই। ওয়াসারটা ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। টিউবওয়েলের বাঁধানো পাড়েই একটা ঘটিতে পানি তোলা ছিল। হাতের কয়লার দাগ খানিকটা সেই পানিতে ধুয়ে তারপর একহাতে নলকূপের মুখ চেপে ধরে সে। অন্য হাতে ঘটির পানি টিউবওয়েলের মধ্যে উপর দিক থেকে ঢেলে তাড়াতাড়ি পাম্প করতে তাকে। পানি ওঠে। ওয়াশারটা খুব বেশি ঢিলা হয়ে গেছে। নইলে এই ঝিমঝিম বর্ষায় টিউবওয়েলে পানি না থাকার কোনোই কারণ নেই।

টিউবওয়েলের উষ্ণ পানিতে মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে ওঠে কায়সুল। বারান্দার তারে তার গামছা টাঙানো। গামছাখানি ভেজা ভেজা। মুখ মুছে ঠিক আরাম হয় না। হঠাৎ হাসি। ব্যাপার কী?

পেছনে তাকালে দেখতে পায় সাবিনা আর রেজিনা দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে। তাদের হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে সমস্ত ঘর।

কী হলো!

দুলাভাই। ও দুলাভাই আপনের পেছনটাতো গেছে। স্যান্ডেলের কাদা ছিটাছে। চটক্যা চটক্যা কাদা আস্যা লাগছে আপনার লুঙ্গিত। গেঞ্জিত। ছিট হয়া গেছে।

সাবিনা কথা বলছে, আর হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছে। কায়সুল অসহায়ভাবে হাসে। তারপর বলে, দাঁড়াও উঠানে ইট বিছাই। তুমি যেন আছাড় না খাও, তার ব্যবস্থা করি।

সকালবেলা মুড়ি, কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, তেল সহযোগে তারা নাশতা সারে। তারপর কায়সুল লেগে পড়ে উঠোনে ইট বিছিয়ে জলকাদা পেরুনোর ব্যবস্থা করতে। বাসার পেছনে কয়েকটা ইট পড়েই আছে, সেখান থেকে এনে বিছিয়ে দিলেই হলো। কিন্তু ঘরের পেছনে ইটের পালার কাছে গিয়ে কায়সুলের ভয় ভয় লাগে। সাপ-টাপ নেই তো। সাপের অত্যাচার এখানে কিন্তু কম নয়। তবে লোকে ভয় পায় না। বলে ঢোঁড়া সাপ। বিষ নেই। কায়সুল অবশ্য সাপ ঢোঁড়া না বিষধর আলাদা করতে পারে না। সাপ দেখলেই তার ভয় লাগে।

ছেলেবেলায় তাদের সবজি বাগানে একবার এক লাউডগা সাপ বেরিয়েছিল। চিকন ছোট্টো সবুজ সাপ। তার ছোটো ছোটো সর্প বিশেষজ্ঞ বন্ধুরা বলতো, এই সাপ থাকে বাঁশঝাড়ে, বাঁশের ডগায় ডগায়। এক কোপে এদের মারতে হয়। যদি কেউ এই সাপকে আঘাত করে, কিন্তু মারতে ব্যর্থ হয়, তবে সে প্রতিশোধ নেবেই। তুমি যেখানেই যাও না কেন ও ঠিকই সেখানে গিয়ে হাজির হবে এবং ছোবল মারবেই। ওই ছোট্টো লাউডগা সাপটাকে একটা বড়ো বাঁশ দিয়ে মারতে চেষ্টা করেছিল বালক কায়সুল এবং ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর বহুদিন তার কেটেছে আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায়। এই বুঝি সাপটা এসে তাকে দংশন করলো।

না। এবার আর ইটের পালা থেকে ইট তুলে উঠানে বসাতে গিয়ে সমস্যা হয় না। কাজটা সমাধা হয় নির্বিঘ্নে। হঠাৎ ঘর থেকে চিৎকার ওঠে সাপ সাপ। হাতে লাঠি না নিয়ে সর্পটাকে নিধন করতে যাওয়া বোকামি। কায়সুলের সমস্ত শরীরে থরথর ভূমিকম্প, কিন্তু হাতের কাছে কোনো লাঠিও পাওয়া যায় না। অগত্যা, হাতের কোদালটা নিয়ে সে ঘরের দিকে যায়। দরজা থেকে সভয়ে তাকিয়ে দেখে, তার শ্যালিকা বিছানায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে সাপ সাপ বলে।

কোথায়, কোথায়?

ওই যে।

সাপ কই। ওতো কেঁচো। এই তুমি দেখেছিলে নাকি সত্যিই সাপ বেরিয়েছে?

বিছানায় দাঁড়িয়েই উৎকণ্ঠিত মুখে সাবিনা বলে, ওইটাই।

এবার কায়সুলের হাসার পালা। সত্যিই কেঁচো। মাটির মেঝেতে বুড়বুড়ি তুলে মেঝেতে পড়ে আছে।

কেঁচোতে অবশ্য কায়সুলের ভয় নেই। কারণ ছোটোবেলায় সে বহুদিন বড়শি দিয়ে মাছ ধরার জন্যে কেঁচো ধরেছে। একটা খুড়পি নিয়ে বাড়ির পেছনে গিয়ে যেখানেই দেখেছে কেঁচোর তোলা মাটির দানা, হোমিওপ্যাথির ওষুধের মতো বিন্দু বিন্দু গোল গোল, সেখানেই খুঁড়েছে সে। কেঁচো বেরিয়েছে বিস্তর। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কোনদিনই কেউটে

সাপের মুখে পড়েনি সে।

শ্যালিকার সামনে বীরত্ব দেখানোর এই হলো উপযুক্ত সময়। কেঁচোগুলো ধরে হাতের তালুতে নেয় সে। সাবিনা কিন্তু চিৎকার করেই চলেছে। ছি, ছি, ছি ইমা।

রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছে রেজিনা। এদের তামাশা দেখে সেও হেসে কুটিকুটি। খুব পালোয়ানগিরি দেখানো হতেছে, চ্যারা (কেঁচো) মার‍্যা বোড়া (গোখড়ো) মারার ডাঁট দেখানো হতেছে। রেজিনার মুখে হাসি। হাসলে তাকে সত্যি সুন্দর দেখায়। গালে টোল পড়ে। গোল ভরাট মুখ। ফর্সা মুখ।

রেজিনা বুকের আঁচল ঠিক করে। মেয়েরা যে কী! পুরুষ তাকালেই বুকের আঁচল ঠিক করতে হবে? সেকি অন্য কোনো দৃষ্টিতে তাকিয়েছে নাকি!

সাবিনা খুব করে ধরেছে, দুলাভাই, চলেন, সিনেমা দেখবার যাই।

কায়সুল ভেবেছিল, আজ বিকেলে বাসার সামনের বাগানে কাজ করবে। গোলাপের কিছু ডাল দিয়ে যাবে তার এক ছাত্র। বর্ষাকাল হলো গোলাপ ডাল লাগানোর উপযুক্ত সময়। বাসার সামনের বাগানে গোলাপ ফুটবে, নানা রঙের গোলাপ, লাল, হলুদ, সাদা আর থাকবে লাল রঙের পাতাবাহারে লেখা— ছায়াকুঞ্জ।

কিন্তু সাবিনাকে সে না করে কীভাবে। বলে, না, সাবি, আজকাল সিনেমা খুব বাজে। ফ্যামিলি নিয়ে দেখার মতো না।

না দুলাভাই। আমজাদ হোসেনের সুন্দরী চলতেছে। খুব ভালো ছবি। ম্যালা পুরস্কার পাছে।

ও, তাই নাকি। আমি অবশ্য এই ডিরেক্টরের নয়নমণি দেখেছি। ভালোই।

ক্যান। গোলাপি এখন ট্রেনে দ্যাখেন নাই ?

নাতো।

ওটা আরো ভালো।

আচ্ছা দুলাভাই। আপনে কার ভক্ত। শাবানার, নাকি ববিতার ?

ববিতার।

তাইলে চলেন। সুন্দরীত ববিতা আছে।

তুমি কার ফ্যান ?

আমি হলাম ভাতের ফ্যান। হি-হি-হি।

বাহ্‌। তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলো। এটাকে বলা হয় পান করা। ইংরেজি পিইউএন। পান।

খিলি পান। মাস্টার সাহেব। চান্স পেয়ে লেকচার দিতেছেন ়িয়া যান। সিনেমাতে কিন্তু যাওয়া লাগবেই।

আজকে না। কালকে।

কালকে তো আপনার কলেজ খোলা।

ফার্স্ট শোতে যাবো।

সন্ধ্যাতে যাবেন। বাড়ি-ঘর একলা ফেল্যা থুয়া।

বাসার কথায় কায়সুলের দিলে চোট লাগে। তাইতো। ঘরদোর ফেলে রেখে তো সে সন্ধ্যায় সিনেমা হলে যেতে পারে না। গেলে ম্যাটিনি শোতেই যেতে হয়। কাল আবার কলেজ খোলা। গেলে আজই সময়। এখন বাজে দুটো। তিনটা থেকে ম্যাটিনি শো শুরু।

না গেলে হয় না ? কায়সুল বলে।

সাবি কথা বলে না। গাল ফুলিয়ে ঘরে যায়।

রেজিনা তখন এগিয়ে আসে। বলে, চলো না গো। মেয়েটা শখ করছে। এখন ক্যামন মাইন্ড করছে। গাল ফুলায়া বিছনাত শুতা আছে।

কায়সুল মনস্থির করে। যেতেই হবে সিনেমায়।

নাও। চলো।

রেজিনা কাপড়-চোপড় পাল্টাতে ঘরে ঢোকে। সাবিনাকে ডাকে— নে নে। রেডি হয়া নে। টাইম নাই।

সাবিনা বলে, না। যাবো না। কারো সময় নষ্ট করা লাগবার নয় আমার জন্য।

ওঠ তো। তোর দুলাভাই আলাভোলা মানুষ। তার কথায় মাইন্ড করে কেউ! ওঠ!

কায়সুলও এগিয়ে যায়। বলে, চলো ছোটো গিন্নি। সময় নাই। তিনটা বেজে যায় যায়। আসার সময় স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলবো খন।

শুনে সাবিনা ওঠে। ফটো তোলার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ। সে এই আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাছাড়া সুন্দরীও তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সাজতে গুজতে দেরি হয়ে যায়। দু'বোনে ঘরে ঢুকে দরজা ভেতর থেকে আটকে দিয়েছে। এই ব্যাপারটা কায়সুলের কাছে চিরটাকালই রহস্যময় মনে হয়েছে। দু'জন মহিলা, তিনজন মহিলা অবলীলায় একটা ঘরে ঢুকে কাপড় পাল্টায়। তাদের নাকি পরস্পরকে লজ্জা করে না। কিন্তু দুটো পুরুষ কি এক ঘরে ঢুকে লজ্জাহীনভাবে কাপড় পাল্টাতে পারবে ?

কায়সুল তো তার প্যান্ট-শার্টটি পরে জুতা পায়ে দিয়ে দু'মিনিটেই তৈরি। কিন্তু সাবিনা-রেজিনার সময় লাগে। ফটো তোলার ব্যাপারটা হেলাফেলার নয়। দু'জনেই চোখে কাজল

দেয়, কপালে টিপ পরে, মুখে একটু পাউডারও বুলিয়ে নেয় আলতো করে। চুলে বেণী করে। শাড়ি পরে, এ-ওর শাড়ির নিচটা ধরে টান দিয়ে ঠিক করে দেয়।

তারপর রিকশা ডাকতে হয়। সিনেমা হলটা বড়ো রাস্তার ওপরে। ছায়াবাণী সিনেমা হল। হলের অবস্থা তেমন সুবিধার নয়। হাফ ইটের দেওয়াল, হাফ কাঠের।

তিনজনে একটা রিকশাতেই উঠেছে। সাবিনা বসেছে রেজিনার কোলে। তার ওপর হুডটা তুলে দেওয়া হয়েছে মাথার ওপর। রেজিনা অবশ্য সর্বংসহা। বোনের ভারে তার উরু চ্যাপ্টা হয়ে গেলেও কিছু বলবে না।

হলে পৌঁছতে পৌঁছতে তিনটা পেরিয়ে যায়। টিকেট কাউন্টারে টিকেট শেষ। কালোবাজারিরা টিকেট হাতে ঘুরছে। হলের সামনে মানুষের ভিড়। বারান্দায় দেওয়ালে ছবির সাদা-কালো স্টিল। ভবঘুরে ধরনের লোকজন সেসবের দিকে তাকিয়ে। হলের বাইরে রিকশা ও ফিরিঅলাদের জটলা।

একজন কালোবাজারি এগিয়ে আসে। লাগবে ডিসি ডিসি। কায়সুল মনে মনে হাসে। একতলা হল। পোড়ো পোড়ো অবস্থা। তার আবার ডিসি। শার্ট নেই, তার আবার পকেট।

এই এদিকে আসো। ডিসি কতো করে। ভিড়ের মধ্যে গা ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে কায়সুল, রেজিনা আর সাবিনা। কায়সুল কালোবাজারির উদ্দেশে বলে।

বিশ ট্যাকা। বিশ ট্যাকা। কয়টা নিবেন— একটা কালোবাজারি জবাব দেয়।

তিনটা।

তিনট্যা। দুইটা দিয়েন বিশ বিশ চল্লিশ। আর এনার লাগি ফ্রি। চল্লিশ ট্যাকা দিলেই চলি যাইবে। সাবিনার দিকে ইঙ্গিত করে কালোবাজারি দাঁত কেলায়।

কী বাজে বকছো।

ওইতো, তিনট্যা চল্লিশ কলাম আর কী।

বিরক্তি ও ক্রোধভরে কায়সুল অন্য কালোবাজারির কাছে যায়। কালোবাজারে টিকেট কিনতে এমনিতেই তার নীতিগত আপত্তি আছে। তার ওপর এমন বেয়াদব। কষে যদি গালে একটা চড় মারা যেতো।

নাহ্। সবচেয়ে ভালো হতো যদি সিনেমা না দেখেই ফেরা যেতো। কিন্তু হল পর্যন্ত এসে সিনেমা না দেখে ফিরতে গেলে পৌরুষে লাগে। তার ওপর সঙ্গে যদি বউ-শ্যালিকারা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই।

৪৫ টাকা দিয়ে অন্য একজন বিক্রেতার কাছ থেকে তিনটা টিকেট কেনে তারা। তারপর হলে ঢুকে যায়। ততোক্ষণে ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। টর্চ লাইটের আলোয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে তারা তিনটা সিটে বসে। সুন্দরী চলছে।

সিনেমা হলের অন্ধকারটা শিগগিরই তাদের চোখ থেকে কেটে যায়। তারা ধাতস্থ হয়।

তখন কায়সুল আশপাশের লোকজনের মুখ, রেজিনা আর সাবিনার মুখের ওপরে আলোর পর্যায়ক্রমিক আসা-যাওয়া সবই দেখতে পায়। পর্দায় রাতের দৃশ্য এলে পুরো হল অন্ধকার

হয়ে পড়ে, দিনের দৃশ্য এলে হলের ভেতরটাও যেন দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

হলের সামনের দিকটায় গণবেঞ্চ। মধ্যভাগে বেঞ্চের পেছনে আবার হেলান দেওয়ার জন্যে কাঠ সংযোজিত। শেষভাগে যেখানে তারা বসেছে, যা ডিসি, তাতে প্রত্যেক দর্শকের জন্যে আলাদা চেয়ারের ব্যবস্থা। খুবই ছোট্টো চেয়ার, টিনের কি স্টিলের, আবার একটু গদি মতোও আছে, নারকেলের ছোবড়া ছেঁড়া রেক্সিনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে, ছারপোকার কিঞ্চিত উৎপাতও থাকা অস্বাভাবিক নয়।

সিনেমাটা বোধহয় ভালোই, রেজিনার চোখে জল এসে গেছে, সাবিনাও চুপ, রোদন গোপন করার চেষ্টায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কায়সুল বসেছে বাঁ দিকে। মধ্যখানে রেজিনা আর সর্বডানে সাবিনা।

হঠাৎ কায়সুল লক্ষ্য করে যে, তার পাশে বসে আছে একজন টিকেট কালোবাজারি। তখন আবার সে তাকায় সাবিনার পাশে বসা লোকটার দিকে এবং ভয়ে কায়সুলের কলেজে ঠাণ্ডা হয়ে আসে, সাবিনার পাশে বসেছে সেই ব্লাকারটা, যে কিনা বলেছিল, এনার জন্য ফ্রি। ভয়াবহ ব্যাপার।

কায়সুলের অধৈর্য লাগে, মনে হয়, এখনই চলে যাই হল ছেড়ে, কিন্তু স্ত্রী ও শ্যালিকার গভীর অভিনিবেশের দিকে লক্ষ্য করে সে সিদ্ধান্তটা ব্যক্ত করতে পারে না। থাক। দেখুক। অস্পষ্ট আলোয় সাশ্রু নয়না রেজিনাকে কতো সুন্দর লাগছে, একটা টিপও দিয়েছে। ভেবেছিল ঘর থেকে বেরুনোর আগেই স্ত্রীর রূপের প্রশংসা করে দেবে সে, তাড়াহুড়োর কারণে করা হয়নি। আর সাবিনা। অল্প বয়সের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। শাড়ি পরা সাবিনাকে সত্যি দারুণ লাগছে। ওরও এই সাজের প্রশংসা করে দিতে হবে। বলতে হবে— সাবি, তোমাকে আজ দারুণ লাগছে। একদম সাবিনা ইয়াসমিনের মতো।

একথা শুনলে কী প্রতিক্রিয়া হবে সাবি'র। নিশ্চয় ক্ষিপ্ত হবে। বলবে— উঁ হুঁ, হুঁ, সাবিনা ইয়াসমিন তো মোটা।

উনি মোটা হলেও ওনার গলা চিকন।

উঁ না না।

কাঁদছো কেন। সাবিনা ইয়াসমিন তো মিষ্টি দেখতে।

না না...।

আর এমন গুণী শিল্পী দেশে দুটো আছে। গুন গুন গুন গান গাহিয়া নীল ভোমরা যায়...।

দুলাভাই। আমি কিন্তু আজই চলে যাবো।

হঠাৎ তীব্র চিৎকারে ভাবনার সুতো ছিঁড়ে যায় কায়সুলের। সাবিনা চিৎকার করে উঠেছে। তারই চিৎকারের বিদ্যুৎ চিৎকৃত করে তুলেছে রেজিনাকে। ওরে মারে, কী হলোরে। কায়সুলও চিল্লিয়ে ওঠে— কী হয়েছে, অ্যাই কী হয়েছে...।

এই লোক আমার গাত হাত দিছে। পাশের কালোবাজারিটার দিকে আঙুল তুলে চেঁচাচ্ছে সাবিনা। লোকজন সব ছুটে এসে ভিড় করে ফেলে জায়গাটায়। দৌড়ে আসে লাইটম্যান। হৈচৈয়ে সিনেমা বন্ধ করে ভেতরের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

কালোবাজারিরা এখানে একা নয়। হলের কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের যোগসাজশ থাকে। তারা ছুটে আসে। কী-না-কী হছে, বাদ দেন বাদ দেন, আসেন আপনেরা কানির সিটে চল্যা আসেন— বলে ফয়সালা করার চেষ্টা করে লাইটম্যান। আর ব্লাকারগুলো একজোট হয়ে বলে, এসব কী কথা, ভদ্দর লোককে অপমান করেন ক্যা, এ লেডিসের চরিত্র খারাপ নিশ্চয়, শুনে কায়সুল খুব রেগে যায়, আর যদি সে রেগে যায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে বিশাল এক হুংকার ছাড়ে— খবরদার— ঝাঁপিয়ে পড়ে বদমাশ কালোবাজারিটার ওপরে। তখন তাকে নিবৃত্ত করতে তার ওপর একসঙ্গে হাত বাড়ায় অন্যসব কালোবাজারি, এ অবস্থায় কোথা থেকে কলেজের চার-পাঁচজন ছাত্র হাজির হয়, তারা তাদের সম্মানিত শিক্ষকটিকে বিপন্ন দেখতে পায় এবং কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসে। কোথা থেকে তাদের হাতে লাঠিসোঁটা চলে আসে, কে জানে, তারা স্যারকে অভয় দেয়, স্যারের স্ত্রী ও শ্যালিকাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসে আর অভিযুক্ত কালোবাজারিটিকে অ্যায়সা মার লাগায় যে, তার সামনের তিনটা দাঁত চিরদিনের জন্যে শাহাদত বরণ করে।

চলেন স্যার। আপনাদের পৌঁছায় দিয়া আসি। ছেলেরা বলে।

তখন কায়সুলের শরীর কাঁপছে, রাগে-উত্তেজনায়, সাবিনা আর রেজিনার বুকের ভেতরটা কাঁপছে ভয়ে আর ঘটনার আকস্মিকতায়।

তারা হলের বাইরে আসে। ছেলেরাই দুটো রিকশা ঠিক করে দেয়। একটায় ওঠে রেজিনা আর সাবিনা। আরেকটায় ওঠে কায়সুল। দুটো সাইকেলে চারজন ছাত্র তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

রিকশা চলছে। সাবিনা কাঁদছে। তার কপালটাই খারাপ। তারই জন্যে আজ এতো বড়ো কেলেংকারি কাণ্ড ঘটে গেলো। আরেকবার তার জীবনে এরকম হয়েছিল। তার একটা মামাত ভাই ছিল। শাহেদ। তারা ঢাকায় থাকে। সেজো মামারা ঢাকাতেই বাড়িটারি করে সেটেলড। শাহেদ খুব গুডি বয় ধরনের ছেলে। ক্লাসে ফার্স্ট হয়। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে পড়ে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ফর্সা মুখ। খাড়া নাক। চশমা খুললে মনে হতো কোন অতল থেকে না জানি এই মাত্র উঠে এলো সে। তো সেই শাহেদ গত বছর ঢাকা থেকে বেড়াতে এলো ফুপুর বাড়ি। করতোয়ার পাড়ে ফুপুর বাড়ি। নদী দেখাও হবে, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কটাও ঝালিয়ে নেয়া হবে।

শাহেদ থাকতো পুব দুয়ারি ঘরটায়। ওদের কুয়োতলার পাশের ঘর। সেদিন সকাল বেলাতেই শাহেদ গেছে চড়কের মেলা দেখতে, সাবিনা তেমনি জানতো। কুয়োতলায় গোসল সেরে, কাপড় পাল্টাতে সাবিনা চট করে ঢুকে গেলো পুব দুয়ারি ঘরে। দুপুরবেলা বাইরে রোদ। হঠাৎ ঘরে ঢোকায় সাবিনার কাছে ভেতরটা মনে হলো ঘন অন্ধকার। সে দ্রুত ঘরের কবাটে খিল তুলে দিলো ভেতর থেকে। তার মাথার চুল থেকে পানি ঝরছে, ভেজা জামা-পাজামা থেকে পানি ঝরছে, কাঁচাঘরের মেঝেটা নষ্ট হচ্ছে, কাপড় তাই তাড়াতাড়ি পাল্টানো দরকার। সে দ্রুত জামাটা আর সেমিজটা খুলে চট করে শুকনো কাপড় পরতে যাবে, হঠাৎ চোখ গেলো বিছানায়, দেখলো, শাহেদ শুয়ে আছে, তার দু'চোখ খোলা, সে অপার বিস্ময় নিয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। সাবিনা চট করে পিঠ ফিরে

শুকনো কাপড়ে মাথা গলিয়ে ফেললো। তারপর ভেজা পায়জামা পরা অবস্থায়ই দ্রুত চম্পট দিলো ঘর থেকে।

এরপর থেকে শাহেদকে দেখলেই সে লজ্জা পেতো। আর শাহেদ তাকে পেতো ভয়। একটা অপরাধবোধে ভুগতো সে। তাকে এড়িয়ে চলতো যতোটা পারা যায়। শেষে তার মুখোমুখি একদিন একলা পড়ে যাওয়ায় শাহেদ বললো, সাবিনা, আমি রিয়েলি স্যরি। সেদিন আমার উচিত ছিল চোখ বুজে থাকা। কিন্তু হঠাৎ কী যে হয়ে গেলো। পাপ হয়তো এভাবেই মানুষকে...। তুমি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করতে পারছো না। পারলে ক্ষমা করো। প্লিজ।

এ ধরনের কথা শোনার জন্যে সাবিনা প্রস্তুত ছিল না মোটেও। বললো, না না। আপনার কী দোষ? ভুল তো আমার। আমারই তো খেয়াল করা উচিত ছিল।

তুমি কিছু মনে করো নাই বলছো ?

সাবিনা চুপ করে থাকে।

তুমি কি মাইন্ড করেছো?

না করি নাই।

আচ্ছা তাহলে তোমাকে একটা কথা বলি। কি, বলবো ?

বলেন।

না থাক।

থাকবে ক্যান। বলেন।

না। বলবো না।

বলেন। দোহাই বলেন।

তুমি খুব সুন্দর। বলেই শাহেদ হন হন করে হেঁটে চলে গেলো চোখের সামনে থেকে।

আবার শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। শাহেদ লুকিয়ে থাকে, পালিয়ে থাকে। ফুপুকে বলে, ফুপু, আমি কালই চলে যাবো। শুনে ফুপু অর্থাৎ, সাবিনার মা চোখের জল ফেলেন। সেকি বাবা, এতো তাড়াতাড়ি যাবা। থাকা যাও কয়েকটা দিন।

তখন আবার এগিয়ে যায় সাবিনা। বলে, ভাইজান, যাবেন ক্যান। থাকেন। আমার একটা হাউশ হছে। আপনে আমাকে নদীত নিয়া যাবেন। নৌকাত চড়াবেন। পরীক্ষাত নৌকা ভ্রমণ রচনা লেখা আসে। নৌকাত না চড়লে লেখা যায়, কন ?

সাবিনার মা বলেন, ক্যা সাবু, তুই কোনদিন নাওত চড়িস নাই। এগলা কেমন কথা ?

চড়ছি। ভুলা গেছি। ফির চড়া লাগবে। ভাইজান নিয়া যাবে।

তো সাবিনার পিড়াপীড়িতে শাহেদ তাকে নিয়ে নৌকা ভ্রমণে বেরুতে রাজি হয়। সঙ্গে থাকে তাদের গরু চরানো ছেলে হামেদালি। সকাল ৯টায় ঘাটে গিয়ে তারা একটা ডিঙি নৌকায় চড়ে। সাবিনা বলে, ও মাঝি, উজানের দিকে যাও। তালে আসার সময় কষ্ট কম হবে।

তারা উজানের দিকে যায়। আর শাহেদের তামাসাটা যদি তোমরা যদি দেখতে। নৌকা একদম ডাঙ্গার উপরে নিয়ে আসো, নইলে তিনি উঠতে পারবেন না। নৌকায় যদি বা পা রাখলো, তার টালমাটাল অবস্থা দেখে কে। একেবারে ৮ মাসের শিশু যেন হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা শিখছে। কোনো রকমে গিয়ে নৌকার মধ্যখানের পাটাতনে গিয়ে বসলো তো দুইহাত দিয়ে আকড়ে ধরে আছে পাটাতনটা। তাই দেখে হামেদালির (১২) কী হাসি। বলে ভাইজান, পানি বেশি লয়, বেশি লয়। লগি পানিতে নামিয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে দেখালো— দেখেন, হাঁটু তো হাঁটু গোড়ালিও ভিজিবে না।

হায়। হায়। সেই হাসিই বুঝি কাল হলো। নদীর মাঝখানে গিয়ে নৌকা বাড়ি খেলো একটা কি জঞ্জালের সঙ্গে। তলা গেলো ফুটো হয়ে। হুল হুল করে পানি ঢুকছে। একটা থালা ছিল নৌকায়, হামেদালি প্রাণপণে সেচছে। আর মাঝি লগি ঠেলছে নৌকা ডাঙ্গার দিকে নেবার জন্য। কিছুই করা গেলো না। নৌকা গেলো তলিয়ে।

ডুবু ডুবু নৌকায় শাহেদের শেষ কান্না— আম্মু, আম্মু— আজো সাবিনার কানে লেগে আছে। আহা বেচারা! পানিতে পড়েই খাবি খাচ্ছে। মাঝি, সাবিনা, হামেদালি তিনজনই সাঁতার পারে। তিনজনই এগিয়ে গেলো তাকে বাঁচাতে, ডাঙ্গার দিকে টেনে আনতে। অনেকটা এনেওছিল। শেষতক সাবিনা আর শাহেদ আলাদা হয়ে গেলো। মাঝি আর হামেদালি উঠলো নদী তীরে। শাহেদ আকড়ে ধরে আছে সাবিনাকে। সাবিনা বলছে, ভাইজান, হাত ছাড়েন, পিঠ ধরেন। আমাক সাঁতরাবার দ্যান। ও আল্লাহ দুইজনেই আজ বুঝি মরি। কিন্তু শাহেদ ছাড়ে না। হাত ধরে। শেষে দুইজনেই তলিয়ে গিয়ে পানি খাচ্ছে। এক সময় শাহেদের হাত খুলে ভুস করে ভেসে উঠলো সাবিনা। শাহেদ গেলো হারিয়ে।

সেই লাশ পাওয়া গেলো দেড় দিন পর। অনেক ভাটিতে। কী যে কেলেঙ্কারি! সাত গাঁয়ের লোক একথা ওকথা বলতে লাগলো। ভাগ্যি সঙ্গে হামেদালি আর নৌকার মাঝি ছিল। নইলে কলঙ্কের খোঁটায় গ্রাম ছাড়তে হতো সাবিনাকে।

আজ রিকশায় যেতে যেতে, পাশে তার বুবু, সাবিনার খুব করে মনে পড়ছে শাহেদের মুখ। লোকটা মৃত্যুর আগে আগে তাকে কী ভীষণভাবে জাপ্টে ধরেছিল। আর সেই আর্তনাদ— আম্মু, আম্মু।

মনে মনে সাবিনাও আজ তার মাকে ডাকছে।

রিকশার চেইন পড়ে যায়। রিকশাঅলা হারামজাদা চেইনের বাচ্চা বলে নেমে পড়ে রিকশা থেকে। তখন সামনে সামনে যাচ্ছিল যে ছাত্র দুজন তারাও থামে। একজন, যে সামনের রডে বসা ছিল, তার গায়ে নীল রঙের জামা, হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে রিকশার দিকে। রিকশাঅলাকে বলে, বাহে কি হইল। রিকশাঅলা গজরাতে গজরাতে চেইন তুলতে থাকে। তখন ছেলেটা, তার মাথায় অনেক বড়ো বড়ো চুল, সাবিনার দিকে চোখ তুলে তাকায়। সাবিনাও তার দিকে।

ছেলেটা আবার রিকশাঅলার তৎপরতা নিরীক্ষণ করে, আবার সাবিনার দিকে তাকায়। সাবিনার সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় ঘটে। রিকশাঅলা সিটে উঠে পড়ে আর লম্বা চুল, নীল শার্টও দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ে সাইকেলের সামনে। তাদের এই পারঙ্গমতাও দেখবার

মতো, একজন সাইকেল চালাচ্ছে, তার বাম হাত ছেড়ে দেয়া, অন্যজন দৌড়ে গিয়ে হ্যান্ডেলে হাত রেখে উঠে পড়ে লাফিয়ে। রিকশা একটা গর্তে পড়ে, আছাড় খায় আর হুডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে মাথায় আঘাত পায় সাবিনা। একটু আগে, সিনেমা হলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটা সে ভুলে থাকে, কেননা সে ভুলে থাকতে চায়।

চলার পথে পুরুষের নোংরা হাত, নোংরা চোখ, নোংরা ভাষা কতোভাবেই না লাঞ্ছিত করে নারীদের। সেসব মনে করে বসে থেকে নিজের জীবনটাকে বিষিয়ে না তোলাই শ্রেয় বটে!

কায়সুলের আজকের দিনটি শুরু হয় অন্যরকম এক আনন্দ নিয়ে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সে যায় তার বাসা ছায়াকুঞ্জের সামনের বাগানে। গোলাপের কতোগুলো কাটা ডাল সে ক'দিন আগে পুঁতে রেখেছিল মাটিতে, সেসব ডালের ওপরে গোবরের টোপর। আজ সকাল বেলা বাগানে গিয়ে দেখতে পায় অনেকগুলো ডালের গিঁট থেকে কুঁড়ি বেরিয়েছে। হালকা সবুজ একেকটা কুঁড়ি। তার মানে, ডালগুলোর গোড়ায় শিকড় গজিয়েছে। তার একবার ইচ্ছা হয় একটা ডাল উপড়ে দেখে সত্যি শিকড় গজিয়েছে কি-না। না, থাকুক। অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়। ধৈর্য ধরতে জানতে হয়।

কাল রাতে, রেজিনা একটা দারুণ খবর দিয়েছে। তার মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলেছে, হ্যাগো, শুনছো, একটা চিন্তার ব্যাপার। এবার যে শরীর খারাপ হলো না। শুনে কায়সুল প্রথমে চিন্তিত বোধ করেছে, বোকার মতো। ভেবেছে মেয়েদের শরীর, কখন কী জটিলতা হয়, কে জানে। খানিক পরে তার মনে হয়েছে, ব্যাপার তো ভালো কিছুও হতে পারে। আরে কী গাধা আমি, প্রথমে মনেই আসেনি সম্ভাবনার কথা। তখন স্ত্রীর কপালে চুমু খেয়ে সে বলেছে, নিশ্চয় সুখবর। ডাক্তারের কাছে গিয়ে বুঝে আসতে হবে।

এখন বাগানের মাটিতে বসে, আশপাশের নাপা শাক আর ঢেঁড়স গাছগুলোর দিকে একবার দৃকপাত করে সে আবার তাকায় গোলাপের ডালে ফুটে ওঠা সবুজ কুঁড়িটির দিকে। একটা ডালকে যখন দুদিক থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন টুকরায় পরিণত করা হয়, তখন কি তাতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকে? নিশ্চয় থাকে, নয়তো কিভাবে এই গোলাপ শাখা থেকে এখন সবুজ সতেজ কুঁড়ির উদগম ঘটে। একটা কুঁড়ি। একটা নতুন বৃক্ষের সম্ভাবনা। কতো ফুলের সৌরভ আর সৌন্দর্যের প্রতিশ্রুতি। তার নিজের জীবনের ধারাবাহিকতা বহন করতে আসবে নতুন একটা ছোট্টো জীবন। অবিকল একটা মানুষ। অনন্ত রহস্যময় মানুষের জন্ম ব্যাপারটা। অথচ প্রতিদিন ঘটছে। এক মিনিটে বাংলাদেশে নাকি সাতটি শিশু জন্ম নেয়।

তার শঠিবাড়ির জীবনটা তাহলে ভালোই শিকড় ছড়াচ্ছে। করতোয়া তীরে ছিল কায়সুল ইসলাম চৌধুরীদের পৈতৃক নিবাস। চৌধুরী বংশ, জমিজমা ছিল বেশ কিছু। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের। নদী সরতে লাগলো। নদীর ভয়াল হা-এর মধ্যে একে একে চলে গেলো তাদের আবাদি জমি, প্রায় সবই। এমনকি তাদের ভিটেমাটিটাও একদিন গিলে খেলো অজগরের মতো নদীখানি। অথচ শীতকালে কী শান্ত তার রূপ। এই নিরীহ নিস্তরঙ্গ প্রায় মরুপথে হারিয়ে যেতে বসা স্রোতধারাখানি যে বর্ষায় এমন প্রবল কূল ছাপানো তীরভাঙা ভয়ংকর রাক্ষসে পরিণত হয়, শীতকালে তাকে দেখলে কে বলবে।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে বেশ কষ্টেসৃষ্টেই পড়েছে কায়সুল। অভাব ছিল, অনটন ছিল। টিউশনি করতে হয়েছে। তবু নির্বিঘ্নে পেয়েছে সেকেন্ড ক্লাস। বাংলা সাহিত্যে এম.এ শুনে অবশ্য লোক আড়ালে-আবডালে বলেছে, ফুঃ। তার কপাল ভালো, শঠিবাড়ির এই বেসরকারি কলেজে একটা লেকচারারের চাকরি সে পেয়ে গেছে। ভালোই লাগে তার। নির্বিঘ্ন জীবন। মাস শেষে সামান্য বেতন। এতো অল্প বেতনে সংসার চালাতে তার কষ্ট হয়। তবে কিছু টাকা সে পেয়েছে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে। নদীর ওপারে জেগে ওঠা চরে তাদের বেশ কিছু জমি আছে। সেই জমির জন্যে লড়াই করতে যাওয়ার প্রবৃত্তি কিংবা উদ্যম কোনোটাই নেই কায়সুলের। তার ভাইয়েরা তাকে বলেছে, তার অংশভাগ লিখে-পড়ে দিতে, সে দিয়েছে। সেই জমি থেকে একবারে বেশ কিছু টাকা ভাইদের বদৌলতে সে নগদানগদি পেয়ে যায় হাতে। তাই দিয়ে শঠিবাড়ি গঞ্জের উপকণ্ঠে সে দশ শতাংশ জমি কিনেছে আর বানিয়েছে একখানি ছোট্টো বাসা। সহজ প্লান। দুটো ঘর। সামনে বারান্দা। ওপরে বাংলো ধরনের ঢেউটিনের দোচালা। একটা টিউবওয়েলের পাড়। তার পাশে একটা বাঁশের বেড়ার গোসলখানা। আরেকটু দূরে স্যানিটারি ল্যাট্রিন। নিচে কুয়োর রিং, ওপরে সিমেন্টের প্যান। চারদিকে বাঁশের বেড়া, ওপরে ঢেউটিন। একপাশে রান্না ঘর। সেটাও কাঁচা। জমিটা যখন কেনে, তখনই দুটো সুপারির গাছ আর একটা কাঁঠাল গাছ পাওয়া যায়। এখন এই দুই বছরে একসারি সুপারির গাছ চারা থেকে বৃক্ষ হয়ে উঠছে। একটা জবা গাছ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে, ফুল দেয়। তবে জবা হলো কাজের ফুল, সৌন্দর্য কিংবা সৌরভের ফুল নয়। কলেজ থেকে ছেলেরা আসে ফুল নিতে, ল্যাবরেটরিতে ডিসেকশন করবে বলে। শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের সংলাপটা মনে পড়ে— মা কালী বড়ো জাগ্রত দেবতা রে। মা কালী নাকি জবা পছন্দ করে। করলে কী আর করা যাবে। যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট আর কী।

কাঁঠালের গাছও উঠছে নতুন তিনটা। এ তিনটা গাছ রোপণের কৃতিত্ব অবশ্য শেয়ালের। শেয়াল আবিচি ভক্ষণ করেছে কাঁঠাল তারপর বর্জ্য রেখে গেছে ভিটেয়, তাতেই গোটা গোটা বিচি উপ্ত হয়ে গেছে।

ফুরফুরে মন নিয়ে কায়সুল নিজের বাগান থেকে বের হয়। আজকের দিনটায় আর বৃষ্টি হবে না মনে হচ্ছে। শঠিবাড়ি একটা ছোট্টো গঞ্জ। চারদিকে এখনও আবাদি ক্ষেত আর বৃক্ষ-লতায় দিগন্ত ঢাকা। বর্ষার জল পেয়ে সবকিছু কেমন সপ্রাণ সবুজ।

পথের ধারে দুটো শালিক। জোড়া শালিক দেখা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আজ নিশ্চয় তার জন্যে অপেক্ষা করছে কোনো সুসংবাদ। ভোরবেলাকার মৃদুমন্দ হাওয়ায় হাঁটতে হাঁটতে

কায়সুলের ঠোঁটে গুন গুন গান এসে যায়। কিন্তু সে গান গায় না। কারণ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার ছাত্র-ছাত্রীরা। কে-না-কে দেখে ফেলবে।

স্লামালেকুম প্রফেসর ছার।

বলতে না বলতেই সালাম। কে। ও! আক্কাস মিয়া, তুমি!

জে। আক্কাস মাথা চুলকায়। ছার, বাসার মাইঝাটা পাকা করিবেন না বাহে। তার দাঁত হলুদ। পরনে লাল লুঙ্গি (এদের ভাষায় নালপিন)। ঘাড়ে গামছা। হাতে একটা কোদাল আর ডালি। আক্কাস তার বাসার যোগানদার শ্রমিক ছিল। পুরো ছয় মাস সে কাজ করেছে রাজমিস্ত্রি খোদা বক্সের সঙ্গে।

না আক্কাস মিয়া। হাতে টাকা-পয়সা নাই। টাকা-পয়সা আসুক হাতে। আবার কাজ শুরু করে দেবো। আজ তোমার কাজ কোথায় ?

না। আজ এলাও কাম পাওঁ নাই। যাইতেছি হাজিবাড়ি। দেখোঁ, কাম কিছু পাওয়া যায় যদিল।

যাও তাহলে। দেরি করে কাজ হারিও না।

আক্কাস মিয়া দৌড়ায়।

আক্কাস মিয়া যোগালি। রাজমিস্ত্রির সহযোগী শ্রমিক। দিনমজুর। দিনচুক্তি কাজ ছিল তার। একটু অলস প্রকৃতির। কাজে বড়ো ঢিলা। আর ঘন ঘন বিড়ি খায়। কিন্তু খুবই সৎ। বিশ্বস্ত। রাজমিস্ত্রির কাজে বিশ্বস্ত লোক হলো আসল। একারণেই নিজের বাড়ির এলাকা থেকে কায়সুল ধরে এনেছিল বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রি খোদা বক্স মৃধাকে। খোদা বক্স মৃধা একটা একটা করে ইট গেঁথেছে। তাকে সহযোগিতা করেছে আক্কাস মিয়া। এছাড়াও আরেকজন যোগালি ছিল। কায়সুল নিজে। সে নিজে ইট টেনেছে। ভিত্তির জন্যে মাটি খুঁড়েছে। অবশ্য তার কাজ ছিল উৎসাহদাতার। যাতে মিস্ত্রি আর যোগালি উৎসাহিত বোধ করে। কিন্তু নতুন গাঁথা দেওয়ালে পানি ঢালার কাজটা খুবই যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যি সত্যি পুরোটাই সম্পন্ন করেছে কায়সুল নিজে।

নিজের ঘরে শুয়ে ঢেউটিনের দিকে তাকিয়ে, কড়ি বর্গার দিকে তাকিয়ে তাই মাঝেমধ্যে বড়ো নস্টালজিক হয়ে পড়ে কায়সুল। বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই, কুঁড়েঘরে থেকে করো শিল্পের বড়াই ? ...কাঁচা হোক তবু ভাই নিজের বাসা, নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা— এইসব কবিতা মনে পড়ে। ধন নয় মান নয়, এতোটুকু বাসা, করেছিনু আশা— উঁকি দেয়। আহা সত্যি তো, বাবুই পাখির মতো এই ঘরখানি সে নিজ হাতে একটু একটু করে গড়ে তুলেছে।

ইট বিছানো রাস্তা এখানেই শেষ। এরপর কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা বেশ করুণ। তবু কায়সুল হাঁটে। আজ সে আরেকটু হাঁটবে। সামনে দুটো তালগাছ আছে। তাল পাতায় বাবুই পাখির বাসা ঝোলার কথা। গাছ দুটো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। কায়সুল সেখানটা পর্যন্ত যাবে। একটা বাবুই পাখির বাসা যদি পড়ে-টড়ে থাকে, তবে সে নিয়ে আসবে সঙ্গে করে।

জমিটুকু কেনার পর খোদা বক্স মৃধাকে নিয়ে এসেছিল কায়সুল। বুড়োটে ছোটো-খাটো মানুষ। থুতুনিতে দাড়ি। এলেন একটা শক্ত ঝোলা হাতে। তাতে তার রাজমিস্ত্রির সরঞ্জাম। বিভিন্ন মাপের কর্নি, লেবেল, লম্বাটে কাঠের টুকরা, মাপার ফিতা, মাপার সুতা, কতো কী। তখন কায়সুল থাকতো একটা ওষুধের দোকানের পেছনের ছোট্টো কক্ষে। সেখানেই আরেকটা চৌকি কিনে বিছানা ফেলা হলো রাজমিস্ত্রির জন্যে। খোদা বক্স মৃধাকে একটা মশারিও কিনে দেয়া হয়েছিল। ওই মশারিটা সারাক্ষণ টাঙানো থাকতো। মিস্ত্রি সাহেব বলতেন, রাতে যখন আবার টাঙানই লাগবে, তাইলে আর বিহানে তুল্যা কী লাভ। এমন মারফতি কথা কায়সুল জীবনে খুব কম শুনেছে। সত্যিতো, যা প্রতিরাতেই বিছাতে হয়, সকালবেলা তা তুলে রাখার দরকার কী।

ছোট্টো বাসা। অল্প বাজেট। খোদা বক্স মৃধা একা একা এটা গড়ে তুললেন অনেকটা কুটির শিল্পের ঢঙে। না, রড সিমেন্ট এক ফোঁটাও এদিক-ওদিক করেননি তিনি। বড়ো কৃতজ্ঞতা বোধ করে কায়সুল।

তাল গাছটার উদ্দেশে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কায়সুলের মনে হয়, বাবুই পাখির বাসায় তো সাপ ঢুকে বসে থাকতে পারে। হয়তো সে তালগাছের নিচে গিয়ে দেখলো একটা বাবুই পাখির বাসা পড়ে আছে। সে সেটা হাতে তুলে নিলো। আর অম্নি ভেতর থেকে ফোঁস করে উঠে ফণা বের করলো এক বিষধর সাপ। কায়সুলের কেমন ভয় ভয় লাগে। না বাবা, দরকার নেই। সে তাড়াতাড়ি তার হাঁটার দিক উল্টে ফেলে।

বাসায় ফিরে দেখে তার বাগানের বেড়ায় সাইকেল ঠেস দেওয়া, পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার ছাত্র মতিন। আইএ পড়ে ছেলেটা। লম্বা চুল, নীল রঙের শার্ট। মনে হয় এই একটাই শার্ট আছে মতিনের।

তাকে দেখে খুবই সংকুচিত বোধ করে মতিন। ব্যাপার কী। কী মতিন উদ্দীন। হঠাৎ সকাল সকাল।

ছার। আপনাকে ছার একটা কথা কতে চাই।

বলো। আসো ভিতরে আসো।

না। ছার। এখানেই বলি। ছার। আমি আপনার কাছে প্রাইভেট পড়বার চাই।

টিউশনি। টিউশনি তো আমি করি না মতিন।

জানি ছার। কিন্তুক ছার আমাকে পড়ান লাগবেই।

কেন। তোমার কী সমস্যা। বাংলা আবার প্রাইভেট পড়ার সাবজেক্ট নাকি ?

বাংলা সেকেন্ড পেপার কঠিন লাগে ছার। গ্রামার। তাছাড়া একটু যদিল ইংলিশটাও দেখায়া দিলেন হয়।

সে তোমার কী সমস্যা— মাঝেমধ্যে এসে দেখিয়ে নিও। কিন্তু আমি টিউশনি করতে পারবো না মতিন। আসো ভিতরে আসো।

না ছার। যাই।

না। যাবে কেন ? নাশতা করেছো। আসো এক কাপ চা খেয়ে যাও।

মতিন এবার সাইকেলে তালা দেয়। সংকুচিত ভঙ্গিতে স্যারের ঘরে প্রবেশ করে। দুই রুমের বাসা। দুটোতেই দুটো বিছানা। একটা ঘরে চারটা লোহা-প্লাস্টিকের চেয়ার আছে, এটা সিঙ্গেল চকির পাশে।

সেই ঘরে মতিনকে বসানো হয়। মতিন একা বসে থাকে। তার স্যার গেছে টিউবওয়েলের পাড়ে হাতমুখ ধুতে।

একটু পর কায়সুল এসে বসে। এই ছেলেটির প্রতি কায়সুল এক ধরনের কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সেদিন সিনেমা হলে এরা থাকায় ইজ্জতটা কোনো মতে বেঁচে গেছে। ছেলেগুলো না থাকলে যে কী হতো।

মতিনের কিন্তু বুক কাঁপছে। তার চোখ মুখ লাল, কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে।

সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। খুঁজছে একটি মুখ। তার স্যারের শ্যালিকা। সেদিন যখন এদের পৌঁছে দিতে তারা এই বাসা পর্যন্ত আসছিল, তখনই চোখে চোখে একটা কিছুর বিনিময় হয়ে গেছে। তারপর থেকে মতিন বড়ো উদাস। তার আর কিছু ভালো লাগছে না। কোনো কিছুতে মনও বসছে না।

এদিকে সকালবেলা মেহমান আসায় রেজিনা কী করবে বুঝতে পারছে না। সকালের নাশতা তারা খায় রুটি আর গুড়। এই জিনিসটা কোনো মেহমানকে দেওয়া সম্ভব না। তাদের চারটা চায়ের কাপ ছিল। এখন আছে মাত্র দুটো। তার মধ্যে একটার কোনা ভাঙা। ঘরে চা অবশ্য আছে। শেষে একটা পিরিচে দুটো টোস্ট বিস্কুট আর এককাপ চা পরিবেশনের সিদ্ধান্ত হয়। সাবিনা একহাতে এককাপ চা (নিচে পিরিচ), অন্য হাতে দুটো টোস্ট বিস্কুটসমেত পিরিচ নিয়ে সার্কাসের ব্যালান্সের কায়দায় ঘরে ঢোকে এবং তার চোখ চলে যায় মতিনের দিকে। মতিনের নামটা অবশ্য তার জানা হয়নি এখনো। মতিন মাথা নিচু করে থাকে। কায়সুল বলে, আসো আসো সাবিনা, এই হলো মতিন উদ্দীন, আমার ছাত্র। আর এ হলো সাবিনা বেগম, তোমার ভাবির বোন। মতিন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে চোখ তোলে। সাবিনাও হঠাৎ তাকায় মতিনের দিকে। চোখে চোখ পড়তেই অকস্মাৎ ১১০ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সাবিনার সমস্ত শরীরে। সে কেঁপে ওঠে আর তার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায়। পিরিচ হাতে ধরাই ছিল। গরম চা ছিটকে পড়ে এদিক-ওদিক। সাবিনার গায়েও।

আজকের দিনটা খুব সুন্দরভাবে শুরু হয়েছিল কায়সুলের। কিন্তু শেষের দিকটা তেমন ভালো হয় না। সন্ধ্যার দিকে দুটো মোটর সাইকেলে চড়ে পাঁচজন ষন্ডামার্কা লোক তার ছায়াকুঞ্জে এসে হাজির। এরমধ্যে দু'জনকে কায়সুল চেনে, সেই কালোবাজারি দু'জন, যারা সিনেমা হলে তাদের দু'পাশে বসেছিল। এদের একজনের তিনটে দাঁত পড়ে গেছে ছাত্রদের ধোলাইয়ে। কালপ্রিট নম্বর ওয়ান।

প্রফেসর সাহেব বাড়িত আছেন ? বলে তারা দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে থাকে।

কায়সুল দরজা খোলে। একজন বলে, ওস্তাদ আপনাক বোলায়।

অর্থাৎ, ওস্তাদ আপনাকে ডাকে। ওস্তাদ বসে আছেন মোটর সাইকেলের ওপরেই। কায়সুলকে যেতে হবে সেখানে।

ওস্তাদ। তোমাদের ওস্তাদ কে ?

ওস্তাদ চিনেন না বাহে। শঠিবাড়িত ওস্তাদ আছে কয়জন ? একজন। উনি হইলেন ওস্তাদ শামসু।

ওস্তাদ শামসুর নাম কায়সুল অবশ্য শুনেছে। শঠিবাড়ি গঞ্জের সবচেয়ে ভয়াবহ লোক। দুটো স'মিলের মালিক। একটা ধান ভাঙা কলও আছে। কিন্তু আসল ব্যবসা শোনা যায়, চোরাচালান। স্মাগলিং। বর্ডার থেকে জিনিসপাতি আনে। আবার বর্ডারে চালান করে। থানা-পুলিশকে নিয়মিত বখরা দেয়। এখন সরকারি দল করে।

ওনাকে ভেতরে আসতে বলেন। উনি এসে বসুন। কায়সুল তাদের বলে।

না। ওস্তাদ বসিবে না। আপনে চলেন। বলে প্রায় জোর করেই তারা তাকে তাদের ওস্তাদের সামনে হাজির করে।

ওস্তাদের গায়ের রং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। মাথায় টাক। গায়ে পাঞ্জাবি, পরনে সাদা লুঙ্গি। সে মোটর সাইকেল থেকে নামে, তখন বোঝা যায় যে, তার এক পা একটু ছোটো।

স্লামালেকুম ছার। আপনাকে কষ্ট দিতেছি ছার। আরেকনা কষ্ট যে করা নাগে। আমার ফজলুর কাছত যে ছার এনা মাফ চাওয়া নাগে।

ওস্তাদের দাবি খুব স্পষ্ট ও সামান্য। তার নিজের লোক ব্লাকার ফজলুর তিনটে দাঁত ভেঙে গেছে, রংপুর মেডিকেল কলেজে তাকে নিয়ে যেতে হয়েছে। এর খরচাপাতি হিসেবে তিন হাজার টাকা কায়সুলকে দিতে হবে। আর যা করতে হবে, তার জন্যে কোনো খরচ নেই। কায়সুল ফজলুর কাছে ক্ষমা চাইবে। আর ছাত্রদের পাঠিয়ে দেবে যেন তারা ফজলুর কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চায়।

কায়সুল রেগে যায়, রাগলে সে মানুষ থাকে না। বলে, ফাজলামি পাইছো, আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, না হলে... না হলে...

দ্যাখেন ছার প্রস্তাবটা ভাবিয়া। তিনদিন টাইম। ইয়ার মাঝত যদিল মাফ চান তো বাঁচি গেলেন। নাইলে ছার শঠিবাড়িত থাকিবার পারিবেন না। বাস। এইটা হইল লাস ওয়ার্নিং।

যান। যান। দেখা যাবে।

আচ্ছা যাইতেছি। তারা মোটর সাইকেলে ধোঁয়া ছেড়ে বিদায় নেয়।

সাইকেল চালিয়ে মতিন উদ্দীন এসেছে ছায়াকুঞ্জের সামনে। সাইকেলের সিটে বসেই একটা গাছের গুঁড়িতে পা রেখে সে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বুক কাঁপে। দরজায় নক করার

সাহস হয় না। একবার মনে হয় সাইকেলের বেল বাজায়। সেটাও হয়ে ওঠে না। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা খারাপ দেখাচ্ছে। সে সাইকেল রেখে বাগানের কাঠের গেট খুলে ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। দরজায় টুকটুক শব্দ করে।

দরজা খোলে সাবিনাই। সে সালাম দেয়। সাবিনা বলে, আপনের ছার তো বাসাত নাই।

ও আচ্ছা। তাহলে আমি যাই।

সাবিনা গেট ধরে দাঁড়িয়েই থাকে। বুদ্ধি করে বলে, ভিতরে আস্যা বসেন।

না। বসি না। ছার কখন আসবে ?

দুলাভাই গেছে একটু ডাক্তারখানাত।

আপনের নাম তো সাবিনা ? না ?

হ্যাঁ।

আমার নাম মতিন। মতিন উদ্দীন।

জানি তো। সেদিন দুলাভাই কলো না।

আপনে কী পড়েন ?

ম্যাট্রিক দিছি। গোলাপবাগ স্কুল থাকা।

এই কলেজত ভর্তি হইবেন ? ছার তো আছেই।

না। গোলাপবাগত কলেজ আছে। নাইলে রংপুর যায়া মহিলা কলেজত ভর্তি হব।

রেজাল্ট তো দেরি আছে, না ?

না। হয়া যাবে সামনের মাসত। রেজাল্টের কথা কন না তো। ভয় লাগে। পাস করি না ফেল করি।

ফেল আবার করবেন। ঠিকে পাস করবেন। ফার্স্ট ডিভিশন পাইবেন।

এহ্। কলো একটা কথা।

রেজাল্ট হলে কি চল্যা যাবেন ? শঠিবাড়ি ছাড়িয়া।

রেজাল্ট তো দেরির কথা। আমি সামনের বুধবার যাতে চাই। দুলাভাই-বুবু ছাড়বার চায় না তো। মুশকিল। বাড়িত মা একলা।

ও।

ক্যান সে কথা ক্যান ?

আপনে চল্যা গেলে.... না থাক।

কন। কী কবার চাছলেন কয়া ফেলেন।

না। অন্যদিন কবো। আজকা যাই।

তাইলে ফির আসিয়েন।

আচ্ছা। আসব।

মতিন উদ্দীন হাঁটে, গেট পার হয়, সাইকেলের তালা খোলে, সাইকেলে চড়ে। তখন বোঝে যে, সাইকেলের চেইন পড়ে গেছে। লজ্জায় সে পেছন ফিরে তাকাতে পারে না। নেমে কিছুদূর হেঁটে গেলে ছায়াকুঞ্জ গাছ-গাছালির আড়ালে পড়ে।

ওদিকে দরজা বন্ধ করে সাবিনা জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মতিন উদ্দীনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে।

ডাক্তার দেখিয়ে কায়সুল ও রেজিনা ফিরে আসে সন্ধ্যার আগেভাগেই। কায়সুলের হাতে একটা মিষ্টির খাঁচারি। বাঁশের পাতলা বাতা ফাঁকা ফাঁকা করে বুনে তৈরি হয়েছে এই খাঁচারি। তারমধ্যে সংবাদপত্র বিছিয়ে মিষ্টি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রসগোল্লা আর নিমকি। কী ব্যাপার দুলাভাই, মিষ্টি ক্যান। সাবিনা জিজ্ঞেস করে। কায়সুল রহস্য করে হাসে। বলে তোমার বিয়ের পয়গাম এসেছে তো, তারই মিষ্টি।

শোনামাত্র সাবিনার বুক ধক ধক করে কাঁপতে থাকে। সত্যি সত্যি মতিন ছেলেটা (নীল শার্ট, লম্বা চুল, সর্বদাই সাইকেলে) দুলাভাইকে কিছু বলেনি তো।

বললে কী বলতে পারে ?

দুলাভাই যদি সত্যি সত্যি তাদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রসঙ্গে কথা পাড়েন, তাহলে সাবিনা কী জবাব দেবে। সাবিনার কাজ-কর্মের ক্রম ওলট-পালট হতে থাকে। চাল ধোওয়ার আগেই সে চুলোয় বসায়। তরকারি কুটতে বসে মনের খেয়ালে একসের আলু কুচি কুচি করে কেটে ফেলে।

এদিকে রেজিনার মনে অন্য চিন্তা। শঠিবাড়িতে ভালো ডাক্তার নাই। একমাত্র এমবিবিএস ডাক্তার যিনি আছেন, তিনি এলএমএফ, কনভেন্সড কোর্সে পরে এমবিবিএস, সুতরাং বুড়ো। ডাক্তারের কাছে কায়সুল আর রেজিনা দু'জনেই যায়। কিন্তু কে সমস্যার কথা আগে পাড়বে, সংকোচে আরম্ভ করতে পারে না। পরে কায়সুল বলে, দেখেন তো প্রেগন্যান্ট কিনা। ডাক্তার তখন বলে, মিনস এর আগে কয় তারিখে হইছিল। এক মোটা আয়াকে বলে, ইউরিন টেস্ট করাও। মোটা আয়া রেজিনার কাছ থেকে তক্ষুণি ইউরিন নেয় আর পরীক্ষা করে। আধঘণ্টা পরে রেজাল্ট পাওয়া যায় পজিটিভ। মানে পেটে বাচ্চা এসে গেছে। শুনে কায়সুল খুশিতে চোখ পিটপিট করতে থাকে। আর মোটা আয়া রেজিনাকে ফিস ফিস করে বলে, আপনাকে এইসুম খুব সাবধান থাকিবার লাগবে। আপনের বাসাত আর কেডা কেডা আছে ?

আর কেউ নাই। খালি আমার ছোটো বোন বেড়াতে আসছে।

না। কাকো থাকিবার লাগবে। আপনের সেবা-যত্ন লাগিবে।

ছোটো বোন থাকবার পারতো। কিন্তু ওতো চল্যা যাবে।

ছোটো বোনের বয়স কতো ?

আমার ৪ বছরের ছোটো ধরেন।

তাইলে তাকে এই সময় বাড়িত থোওয়া ঠিক না। বউ পোয়াতি হইলে পুরুষ মানুষ খুব

উচাটন থাকে। বাউদিয়া হয়া যায়। আপনে আপনার বোনকে দ্যাশে পাঠায়া দ্যান।

রেজিনা একবার সাবিনার মুখের দিকে তাকায়। একবার কায়সুলের ভাবগতিক বোঝার চেষ্টা করে। সন্দেহজনক কিছু দেখা যায় কি ? সত্য বটে, সাবিনার ভাব-সাব ইদানীং ভালো দেখায় না। লক্ষণ কেমন উড়ু উড়ু। ছি ছি। এসব কি ভাবছে রেজিনা। আজ তার সত্যি একটা শুভদিন। ডাক্তার তাকে বলেছে, পেটে সন্তান এসে গেছে। সেই অনাগত সন্তানের আগমনকে অভিনন্দিত না করে সে কিনা কুটিল সন্দেহে বিষিয়ে তুলছে নিজের অন্তরকে।

রাতের খাবার তারা খায় মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে। মধ্যখানে একটা হ্যারিকেন। তিনজন একসঙ্গে খেতে বসে। রেজিনা লক্ষ করে— সাবিনা ভাত নাড়ে-চাড়ে, কিন্তু খায় না। সে বলে, সাবি, তোর কী হইছে ?

কই কিছু হয় নাই তো।

ভাত খাইতেছিস না। এক দানা ভাতও তো নড়ে নাই থাল থাক্যা। কী অতো ভাবনা করিস সাত-পাঁচ ?

না কিছু না। কাঁসার গেলাস তুলে সাবিনা পানি খায় এক ঢোক।

তোর কি ফাঁপর লাগতেছে। তুই কি বাড়িত যাবার চাইতেছিস ?

না তো। আমি তো ঠিকে আছি। বলতে বলতে তার চোখ জলে টলমল করে। সে আঁখিজল গোপন করবার উপায় খুঁজতে থাকে।

কায়সুল তখন হস্তক্ষেপ করে। বলে, আহা। মেয়েটাকে কেন এসব বলছো। এতো বড়ো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো সেদিন সিনেমা হলে। ওর মনতো খারাপ হতেই পারে।

সাবিনা ভাতের থালা নিয়ে উঠে চলে যায় কলতলায়। তার আর খাওয়া হয় না।

আঠারো বছরের মেয়েদের মতিগতি ভাদ্রের আকাশের মতো। আগে থেকে পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। এই রোদ তো এই বৃষ্টি।

সেদিন ভোরে আকাশে ছিল মেঘ। বাতাসে ছিল গুমোট ভাব। কিন্তু বৃষ্টি ফোঁটা একটাও নামেনি ধরিত্রীতে। অসহ্য গরমে হাঁসফাস করছিল সবাই। এমনকি উঠোনের হাঁস-মুরগির কুঠুরিটা থেকেও আসছিল নির্ঘুম পাখিদের রোদনময় ডাক। রেজিনা কিন্তু ঘুমুচ্ছিল বেঘোরে। গরমের আতিশয্যে ব্লাউজ খুলে শুধু শাড়ি পরে শুয়েছিল সে। আর গরমে জেগে

কায়সুল একটা তালপাখা দিয়ে বাতাস করছিল ঘুমন্ত স্ত্রীকে। তার স্ত্রী ছিল ঘামে ভিজে জবজবে। পাখার বাতাসে ঘাম শুকিয়ে সে নিশ্চয় খানিক আরাম পায়। পরম নিশ্চিন্তে সে ঘুমুতে থাকে। তার নাকের ডগার বিন্দু বিন্দু ঘামের দিকে ভোরের আবছা আলোয় তাকিয়ে থাকে কায়সুল। অন্যদিন এ সময়ে কায়সুল উঠে পড়ে, উঠে পড়ে রেজিনাও। কিন্তু আজ কায়সুল বিছানা ছাড়তে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, রেজিনা ঘুমুচ্ছে, কী দরকার তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর।

আর দ্যাখো, এই মানুষটির শরীরের মধ্যে বেড়ে উঠছে আরেকটি মানুষের শরীর, তার নিজের সন্তান। কী আশ্চর্য রহস্যময় এই জন্মপ্রক্রিয়া।

সেদিন ভোরে আকাশে ছিল মেঘ, বাতাস ছিল গুমোট। ঘরের মধ্যে গন্ধ ছড়াচ্ছিল আতপ চালের, তাতে খানিক উদ্বিগ্ন বোধ করেছিল কায়সুল, ঘরে সাপ মতান্তরে গন্ধমুষিক ঢুকে পড়লে নাকি এরকম গন্ধ হয়।

ঠিকভাবে সকাল হবার আগেই, রেডিওতে অনুষ্ঠান ঘোষক সবে সকলকে সালাম জানানো শুরু করেছে, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করেছে কোরআন তেলাওয়াত, একহাতে রেডিওটা খুব লো ভলিয়মে চালিয়ে দিয়েছে কায়সুল, বাইরে মোটর সাইকেলের ভটভট আওয়াজ শোনা যায়।

দরজায় আওয়াজ, প্রথমে ঠকঠক, তারপর দুমদাম। ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠে রেজিনা, তার শাড়ির আঁচল বিছানায় গড়ালে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় কায়সুল দেখতে পায় সন্তানসম্ভবা এক রমণীর উদলা বক্ষ, কিন্তু তখন সৌন্দর্যবিচার ও মুগ্ধতার সময় নয়, দরজার আওয়াজটা বিকট হুংকারের মতো পিলে চমকে দিচ্ছে, ব্লাউজ খুঁজে তাড়াতাড়ি পরতে গিয়ে রেজিনা উল্টো করে পরে ফেলে আর বোতাম লাগাতে না পেরে একটা সেপটিপিন মাঝামাঝি কোনোমতে লাগায়, কে, হ্যাগো, অমন করে দরজা ধাক্কায় কে।

কায়সুল প্রথম হতবিহ্বল, তারপর চিৎকার করে ওঠে, কে কে, দাঁড়ান। দরজা ভেঙে ফেলবেন নাকি। ও ঘর থেকে চোখ-মুখ রগড়াতে রগড়াতে আসে সাবিনা, তার ওড়নার একপ্রান্ত মেঝেতে গড়াচ্ছে, দুলাভাই ও দুলাভাই, কী হোছে।

কায়সুল দরজা খোলে। ছিটকিনি তো লাগানো ছিলই আর ছিল একটা আড়াআড়ি বড়ো কাঠের দণ্ড, সেটা সে হাতে নেয়। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ওস্তাদ শামসুকে। তার পেছন আরো আরো লোকজন।

আসসালামো আলায়কুম, শামসু বলে। তার মাথায় আজ একটা সাদা গোল টুপিও শোভা পাচ্ছে। বিহানবেলার ঘুমটা নষ্ট হয়া গেলো। কিন্তুক উপায় আছিল না ছার। আপনাক কলাম বলে ফজলুর কাছে মাফ চান। চালেন না। এখন ছার হামাক হামার ঘাটা দেখা লাগলো।

এই সব কথা বলার জন্য আপনি সাতসকালে এসেছেন। আপনার সাহস তো কম না, কায়সুল বলে।

না ছার। কোনো কথা কতে আসি নাই। আসছি নিজের জায়গা-জমির দখল নেওয়ার জন্য। অবৈধ দখলদার তুল্যা দেওয়ার জন্য সকাল সকাল আসলাম, নাইলে ছার সানঝের

বেলে আপনাদের কষ্ট হইল হয়। আপনেরা কোটে থাকবেন না থাকবেন, দিনের বেলাত হলে ঠিক করবার টাইম পাবেন। তা ছার, ঘরদোর ছাড়েন।

কী বলছেন আপনি এসব ?

ছার। ঠিকই বলতেছি ছার। এই জমিন ছার হামার। ক্র[illegible] পাওয়া। এই যে দলিল। সব কাগজ ঠিকঠাকমতো আছে। এখন হামার জায়গা হামার [illegible]ন। ঘর-দুয়ারও হামার। হামাক থাকবার দ্যান। আপনে ঘর ছাড়েন।

আমার কাছে দলিল আছে। আমি জমি কিনেছি। নিষ্কন্টক জমি। একটা একটা করে ইট বিছিয়ে ঘর তুলেছি।

এসব কথা কয়া লাভ নাই। বারান। আর মায়া লোকদের বারাতে কন। এই তোরা দেখিস য্যান মায়ালোকের গাত হাত না পড়ে।

সে ভোরে আকাশে ছিল মেঘ, বাতাস গুমোট, অসহ্য গরম, হাঁস-মুরগিগুলোনও ছটফট করছিল গরমে; আর কায়সুলের হাতে ধরা ছিল কবাট বন্ধ করার লাঠিখানি। সবার আগে একজন হালকাপাটকা লুঙ্গি পরা লোক সেইটে কেড়ে নেয় অকস্মাৎ। তারপর দশ-বারোজন লোক, ষণ্ডা, তারা ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে। মেয়েদের গায়ে হাত না তোলার আদেশ তারা পালন করতে পারে না। ক্রন্দনরত নারী দু'টোকে তারা খোলামকুচির মতো ছুড়ে ফেলে দেয় সামনের রাস্তায়। আর একে একে ঘরের জিনিসপত্র ছুড়তে থাকে এদিক-সেদিক বাইরে। নতুন সংসার, সামান্য জিনিসপত্র, তবুও সংখ্যায় কম নয়, আর প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে রয়েছে ব্যক্তিগত নানা স্মৃতি, কোনোটা মায়ের দেওয়া, দেওয়ালে দু'টো বাঁধানো ছবি, রেজিনার নিজ হাতে সুই-সুতোয় বোনা, দু'টো ট্রাংক, একটা মিটসেফ, একটা আলনা, একটা খাট, একটা চকি, কয়েকটা বেতের চেয়ার আর সংসারের কতোগুলো গোপন জিনিস লোক সমক্ষে প্রকাশিত হয়ে এমনভাবে মুখ ভেংচায়, যে লজ্জা করে, যেমন তোশক আর বালিশ। ফুটো বালিশ থেকে তুলো উড়ছে, বালতি-বদনা-বাথরুম ধোওয়া ঝাঁটা— কতোকিছু! পড়ার বই, সস্তা বাঁশের বুক শেল্‌ফ, জীবনানন্দ দাশের কবিতার বই, গীতবিতান... সবকিছু এসে পড়ছে রাস্তায়, ধুপধাপ, দুদ্দাড় আর কেঁদে চলেছে রেজিনা, আছড়ে আছড়ে পড়ছে মাটিতে। ধুলোয় লুটোচ্ছে তার আঁচল, তাকে সামলাতে যাবে নাকি নিজেই কাঁদবে বুঝতে পারছে না সাবিনা। আর কায়সুলকে ধরে আছে দুইজন ষণ্ডা, কায়সুল চিৎকার করে বলছে, আমি এই অন্যায় জুলুমের শেষ দেখে ছাড়বো। সব ক'টাকে খুন করে চামড়া ছিলে নেবো... কিছুক্ষণের মধ্যে তার অসহায়ত্বকে ব্যঙ্গ করে সব ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপারগুলোও উলঙ্গ নৃত্য করতে থাকে রাস্তায়— বদনা আর কাঁথা, পুরনো সংবাদপত্র আর ভাঙা ফুলদানি।

চিৎকার-চেঁচামেচি হৈচৈয়ে আশপাশের লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী ভিড় জমায়। দু'টো নেড়িকুত্তা তেড়ে এসে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে প্রাণপণ। হায় হায় একি হলো বলে একজন বৃদ্ধা ভিখারিনী বসে পড়ে জাম গাছতলায়, কিন্তু কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না। ফুলবনে মত্তহস্তীর কথা মনে পড়ে কায়সুলের, রেজিনার সমস্ত দুনিয়া দুলতে থাকে, যেন

গাছপালা, ঘরদোরসমেত মাটি উঠে যাচ্ছে আকাশে, তার পা উপর দিকে মাথা ঝুলছে নিচের দিকে, এমন অত্যাচার-নিপীড়ন-অন্যায়— কী করছে সহ্য করছে উপরওয়ালা। কেন আকাশ ভেঙে পড়ছে না...?

তখন কায়সুল তাকে ধরে থাকা লোক দু'টোর ওপর জোর খাটায়, নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। চিৎকার করে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি থানায় যাবো, পুলিশ ডেকে আনবো। ধাক্কাধাক্কিতে লাভ হয় না, শেষে নিজে নিজেই কিছুটা নিরুত্তেজিত হয়ে গেলে সে বলে, ভাই, ওস্তাদকে একটু ডাকেন।

ওস্তাদ শামসু আসে, কায়সুল বলে, ওস্তাদ, আমি থানায় যাবো, পুলিশ আসুক, আপনার কাগজপত্র দেখুক, আমারটা দেখুক, বলুক, জমি কার, ঘর-দুয়ার কার।

ওস্তাদ শামসু মিয়া হাসে। কালো শরীরের মধ্যে পান খাওয়া দাঁত ঝিলিক দেয়। দেরে, ছারক ছাড়্যা দে।

ওরা সত্যি সত্যি কায়সুলকে ছেড়ে দেয়। তখন এই বিশাল পৃথিবীর সামনে নিজেকে তার যে কতো ক্ষুদ্র তুচ্ছ মনে হয়, তার প্রিয় ব্যক্তিগত স্মৃতি সঙ্গখচিত জিনিসগুলোকে পথের মধ্যে বন্য হাতের নোংরা ছোঁয়ায় অপবিত্র হতে দেখে তার ভেতরটা যে কীভাবে মরমে কুঁকড়ে কেন্নো হয়ে যায়। সে খুব ধীর-স্থির ভঙ্গিতে স্ত্রী ও শ্যালিকার কাছে যায়, বলে, কান্না-কাটি করো না, আমি এখনই থানায় যাচ্ছি, তোমরা জিনিসপত্রগুলো একটু দেখো।

সে ছিল বড়ো উদ্ভ্রান্ত সময়, পরে কায়সুল অনেকবার ভেবে দেখেছে, যে-লোকগুলো পরিকল্পনা করে সিনেমা হলে তাদের দুইপাশের সিটে দু'জন বসে পড়েছিল এবং নিগৃহীত করেছিল একজন তরুণীকে, তাদেরই মারকুটে থাবার নিচে দুই দুইজন নারীকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়াটা ছিল চরম বোকামি, কিন্তু তখন ব্যাপারটা মাথাতেই আসেনি আর ততোক্ষণে সকাল হয়ে গেছে।

বাগানে ছুড়ে ফেলা রেডিওটা হঠাৎ বেজে ওঠে, শোনা যায় সাতটার সংবাদ। আর ওস্তাদ শামসু ছোট্ট বেলি ফুলের ঝাড়টা থেকে একটা বেলি ফুল নাকের ডগায় ধরে বলে, ফাস ক্লেলাস ফাস ক্লেলাস বাসনা।

তখন কায়সুলের নাকে এসে লাগে বেলি ফুলের ঘ্রাণ, তার নিজ হাতে লাগানো বেলি গাছে তিনটা কলি দু'টো ফুল দেখা দিয়েছে। একটা ছোট্ট ডাল সে পুঁতেছিল গত বর্ষায়, সে ডাল এখন রীতিমতো গুল্ম এবং পুষ্পময়, সেই পুষ্পের সুঘ্রাণটুকু নাকে নিয়ে উদ্ভ্রান্তপ্রায় কায়সুল ছুটতে থাকে একটু শরণ ও একটু সাহায্যের আশায়।

রেজিনা আর সাবিনা, দুটি অরক্ষিত পুষ্পকে তাহলে কিসের ভরসায় সে রেখে যায়। সম্ভবত দিনের আলো আর চারদিকে জমা হওয়া জনতার বরাভয়ের কাছে।

কায়সুল প্রথমে ছুটে যায় প্রিন্সিপ্যাল স্যারের কাছে। শঠিবাড়ি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম তালুকদার তখন ছিলেন বাথরুমে। কায়সুল তার ছোট্ট টিনে ছাওয়া পাঁচ ইঞ্চি ওয়ালের বাংলো প্যাটার্নের বাসার ছোট্ট বসার ঘরে বেতের চেয়ারে বসে পড়ে। দেওয়ালে কাজী নজরুল ইসলামের ছবিওয়ালা একটা ক্যালেন্ডার, তাতে ঝাঁকড়া চুলের নজরুলের হাতে আঁকা রঙিন ছবির চারদিকে রঙিন ফুল এবং জিজ্ঞাসা— ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি!

ক্যালেন্ডারটি বেশ পুরনো, কাগজ লাল হয়ে গেছে। তার মাথার উপর কাঠের তক্তা দিয়ে একটা তাক মতো বানানো হয়েছে, তাতে নানা বইপত্র-পঞ্জিকা, প্রাথমিক বৃত্তি সহচর, ছোটোদের মহানবী, আজমির শরীফের পথে ইত্যাদি লক্ষ্যগোচর হয়। মাকড়সার জালের পাশে একটা টিকটিকি এই সকালবেলায় সম্ভবত প্রাতঃরাশের সন্ধানে অ্যামবুশ করে আছে। বেতের চেয়ারের সামনে রাখা বেতের ছোট্ট টেবিলের নিচে পুরনো খবরের কাগজ দৈনিক ইত্তেফাকও দেখা যায়। মিনিট পাঁচেক বসার পর প্রিন্সিপ্যাল স্যার আসেন। তার পরনে লুঙ্গি গায়ে গেঞ্জি, চোখে চশমা। কী গরম পড়েছে দেখছেন বলে প্রিন্সিপ্যাল স্যার ঘরে ঢোকেন!

স্যার। কী অন্যায় স্যার। কতোগুলো লোক আমার বাসায় ঢুকে আমাদের সবাইকে বের করে দিয়েছে! জিনিসপত্র সব রাস্তায় ছুড়ে ফেলে ভেঙে চুরে সব তছনছ করে দিয়েছে স্যার।

তখন ভেতর থেকে একটা মেয়ে (কাজের মেয়ে হবে) এসে বলে, খালু আপনার চা হইছে, খালা আপনাকে ভিতরে ডাকে।

প্রিন্সিপ্যাল বলেন, কী হয়েছে! এসব কী বলছেন!

জি স্যার। বলছে, এই জমি নাকি তাদের! আমি বেদখল করে খাচ্ছি। তারা বেদখলদার উচ্ছেদ করতে এসেছে! কায়সুল কাঁদতে থাকে, দুচোখ দিয়ে দরদরিয়ে জল পড়ে, ভেউ ভেউ শব্দে তার বাক্য হারিয়ে যায়।

ভেতর থেকে খনখনে আওয়াজ আসে, অ্যাই, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, ভিতরে আসো না ক্যা!

কারা করছে এসব! জমিজমা নিয়ে ডিসপিউট ছিল নাকি।

ওস্তাদ শামসু মিয়া।

তার লোক!

না স্যার। সে নিজেই এসেছে। বলছে জমি তার।

সর্বনাশ! প্রিন্সিপ্যাল শরীর ছেড়ে দ্যায় বেতের সোফায়। তার স্থূল শরীরের চাপে সোফা মচমচ করে ওঠে।

সর্বনাশ তো স্যার বটেই!

না। ওস্তাদ শামসুর কথা বলছিলাম। লোকটা খুব ডেঞ্জারাস। ব্যাপারটা তো ছেলেখেলার পর্যায়ে নাই।

স্যার। আমার ফ্যামিলি রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে! ছেলেখেলার প্রশ্ন তো আসেই না স্যার।

তখন মেয়েটা এক কাপ চা প্রিন্সিপ্যালের সামনে রাখে। প্রিন্সিপ্যাল তার ওপর রেগে যান— ভাগ এখান থেকে। চা নিয়া আসছে এই...। মেয়েটা তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না, কাপ রেখে চলে যায়।

স্যার। এখন আমি কী করবো স্যার ? কান্নামাখা সুরে কায়সুল বলে।

থানায় যান। থানায় যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখি না।

স্যার। আমি থানায় যাচ্ছি। আপনি স্যার আমার ফ্যামিলির জন্য একটা ব্যবস্থা করেন। ওরা রাস্তায়...

আচ্ছা। আমি দেখছি। ন্যান আপনি চাটুকুন খায়া ন্যান।

কায়সুল ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়াতে থাকে।

মিঠাপুকুর থানা শঠিবাড়ি থেকে বেশ দূরে। সাইকেলে যাওয়া যায়। সবচে' ভালো হলো বাসে যাওয়া। ভাড়া এক টাকা। শঠিবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কায়সুল ছটফট করে। রংপুরের দিকের বাস আসছে না কেন?

তার মনে হয় মুখ ধোওয়া হয়নি, প্রাতঃক্রিয়াদির কোনোটাই সারা হয়নি। স্কুলপাঠ্য দ্রুতপঠন বইয়ে একটা গল্প আছে— নিয়তির পরিহাস। এক সম্রাট সকালবেলা আয়োজন করেছেন বিশাল ভোজ, শত শত হাঁড়িতে চাল ফুটছে, ঘি ঢালা হচ্ছে; হঠাৎ বহিঃশত্রুর আক্রমণ, স্বীয় বাহিনীর পরাজয়, অতঃপর পলায়ন। এক নির্জন প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছেন সম্রাট, একটি মাত্র সহচর তার সঙ্গে। সারাদিন খাওয়া হয়নি কিছুই। অতিকষ্টে চেয়ে চিন্তে একটা মাটির হাঁড়ি আর কিছু চাউল যোগাড় করা গেলো, খড়-কুটো জ্বালিয়ে ভাত রাঁধার প্রক্রিয়া শুরু হলে তা দিয়ে। খানিক পর এক কুকুর এসে মুখ দিলো হাঁড়িতে, তাড়া করতেই পুরো হাঁড়িটার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ফেললো কুকুর, তখন সেই হাঁড়িটা উদ্ধার করার জন্য কুকুরের পেছনে ছুটছে সম্রাট আর তার সহচর। তারপর দেখা গেলো, হাঁড়ি গেছে ভেঙে, কুকুরের গলায় মালার মতো ঝুলছে হাঁড়ির কোনা। আধা সিদ্ধ ভাত জঙ্গলের ঘাসে-মাটিতে ধুলোয় মিশে গেছে, কখন, কোথায়! ক্ষুধিত, ক্লান্ত সম্রাট বসে পড়লেন মাটিতে, তার মনে পড়লো, আজ সকালেই তার ভোজ উৎসবে শত হাঁড়িতে চাউল উঠেছিল!

এখনো কায়সুলের মুখ ধোওয়া হয়নি।

প্রাতঃক্রিয়াদি সারা হয়নি। মাত্র ঘন্টাখানেক আগে যা ছিল নিজের ঘর, নিজের বাড়ি, এখনই কি তা অন্যের ঘর, অন্যের বাড়ি হয়ে গেছে। ওই টিউবওয়েলটা থেকে এখন কি সে পানি সংগ্রহ করতে পারবে না! ব্যবহার করতে পারবে না ওই বাড়ির বাথরুম-টয়লেট!

একটা বাস এসে যায়। দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠে পড়ে কায়সুল। তখন হুঁশ হয় যে, পকেটে একটা টাকাও নেই। উত্তেজনায় ঘটনার আকস্মিকতায় সে খালি হাত-পা নিয়েই রওনা হয়েছে।

বাস ভাড়া বেশি নয়, মেইল বাসে এক টাকা, লোকাল বাসে বারো আনা। কিন্তু যখন তোমার কাছে বারো আনাই নেই, তখন তো তুমি ফকিরই। আর যখন তুমি বাসের কন্ডাক্টর, তখন বারো আনা তো বারো আনাই, এক আনা কম নেওয়াও তোমার জন্যে হারাম, ১০ পয়সার জন্য তুমি কলার ধরতে পারো যে কোনো কারুর, তেমনি ২৫ পয়সার ভাড়া চাওয়ার অপরাধে তোমার হাড্ডি গুঁড়ো করে দিতে পারে কতিপয় অবাধ্য ছাত্র-যাত্রী।

সকাল বেলাকার বাসে তেমন ভিড় নেই, পেছনের আসন ফাঁকা। কন্ডাক্টর ধাক্কা দেয়, আগে বাড়েন, আগে বাড়েন। সিট আছে তো, যায়া বসি পড়েন! কন্ডাক্টরটা নিতান্তই চ্যাংড়া, এই গরমেও সে গলায় পরে আছে মাফলার আর তার গলাটাও বেশ বসা বসা। কী হইল, যান না, বসেন না! কন্ডাক্টর আবার তাগাদা দেয়।

কায়সুল বসতে যায় না, কারণ তার পকেটে ফুটো পয়সাটাও নেই, দাঁড়িয়ে যাওয়ার ভাড়াই নেই তার কাছে, বসে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

কথাটা কীভাবে পাড়া যায়, কায়সুল ভেবে কিনারা করতে পাচ্ছে না। শেষে— যান বসেন না— কন্ডাক্টারের মুদ্রাদোষের মুখে সে বলে, না, বসবো না। সামনে মিঠাপুকুর থানাতেই নেমে যাবো।

ও। ডিপার্টমেন্টের লোক। কন্ডাক্টর খাতির জমানো হাসি হাসে।

কায়সুলের পরনে লুঙ্গি, গায়ে শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল, চোখ-মুখে ক্লান্তি আর হতাশা, চুল উস্কোখুস্কো— তাকে কন্ডাক্টর কোন্ ডিপার্টমেন্টের লোক ভাবে সেই জানে! সে আর ভাড়া চায় না। বরং মিঠাপুকুর থানা এসে গেলে, সে চিৎকার করে ওঠে, ওস্তাদ। থানার লোক আছে। একনা সোলো করি যান। হালকা হালকা।

তার চোখের ইশারায় কায়সুল বাসের গেটে যায়, হেলপার তাকে হেলপ করে, বাস স্লো হয়, কায়সুল সম্পূর্ণ বিনাভাড়ায়, বিনাভারে বাস থেকে মাটিতে অবতীর্ণ হয়।

তখন মাটিতে নেমে আসার পর কায়সুল বুঝতে পারে এভাবে চলে আসা ঠিক হয়নি। প্যান্ট-শার্ট পরে আসা উচিত ছিল অন্তত, পকেটে সামান্য কিছু হলেও পথখরচ থাকাটা ছিল জরুরি। তবু, এখন, যখন তোমার ঘরে আগুন লেগেছে, দমকল বাহিনীকে খবর দিতে যাচ্ছো তুমি, তোমর পরনে কী আছে না আছে, সেই প্রশ্ন কি অবান্তর নয়।

মিঠাপুকুর থানাটা কিন্তু খুব সুন্দর জায়গায়। একটা বড়ো পুকুরের উঁচু পাড়ে, যেন পাহাড়ের ওপর। আর উঁচু পাড়ের ঢালে নানা ফুলগাছ, করবী, কাঁঠালচাঁপা, দেবদারু।

থানার ইনচার্জ অফিসার নেই। ডিউটি করছেন একজন পুলিশ সদস্য। কায়সুল তাকে নিজের পরিচয় দেয়। তার সমস্যার গুরুত্ব তুলে ধরে। এই পুলিশ সদস্যটি, তার বুকে লেখা মকবুল, সমস্যার তীব্রতা অনুধাবন করতে পারে বলে মনে হয়। সে বলে, আপনের তো সিরিয়াস কেস। দাঁড়ান। ওসি স্যারকে ডাইকা আনি।

ওআইসি সাহেবের আসতে দেরি হয়। তিনি আসেন। তার ভুঁড়ি বড়ো, খাকি শার্টে ভুঁড়ি আটকাচ্ছে না, বোতামের ফাঁক দিয়ে ভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি আসছেন শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে। কিন্তু প্যান্টের জিপার এখনো লাগানো হয়নি। সেটা তিনি লাগান তার সিটে বসতে বসতে।

কায়সুল নিজের পরিচয় দিতে যায়, আশ্চর্য যে, এইবার সে নিজেকে প্রফেসর দাবি করে। বলে আমি, প্রফেসর কায়সুল ইসলাম চৌধুরী। শঠিবাড়ি কলেজের প্রফেসর। সে তার সমস্যার কথা বলে। ওআইসি চোখ ছোটো করে, ভ্রূকুচকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়। এ ধরনের সমস্যার কথা সে কখনো শোনে নাই— এমন ভাব করে। কায়সুলের বলা শেষ হলে, সে বলে যে, জিডি এন্ট্রি করেন।

কায়সুল ভাবে যে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে যাচ্ছে। আসলে এসব কিছু না। একটা সাদা কাগজে তাকে সমস্যাটার বিবরণসমেত দরখাস্ত দিতে বলা হয়। লেখেন বরাবর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর থানা। কায়সুল লেখে। তখন একটা রেজিস্ট্রি মোটা খাতায় অফিসারটি জেনারেল ডায়রি লেখে এবং লিখতে গিয়ে সে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে— স্যার, আপনার বাড়ি আলমডাঙ্গা নাকি স্যার! আপনি আলমডাঙ্গার চৌধুরীবাড়ির ছেলে নাকি ? কী বলেন! আমার বাবা তো ওই বাড়িতে লজিং ছিল! সে কোন আমলের কথা! আর আপনি...আপনি এই শঠিবাড়িতে বাড়ি করেছেন নাকি ?

কায়সুল ধড়ে জান ফিরে পায়! এবার নিশ্চয় একটা গতিক হবে!

তো আপনি বলেন, কী মগের মুলুক! সিনেমা হলে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করলা তুমি আবার তার জের ধরে আমার বাড়িঘর থেকে তুমি উচ্ছেদ করবা আমাকেই। ওসি সাহেব। চলেন, লোকজন নিয়ে চলেন আমার সঙ্গে।

কিন্তু স্যার একটু সমস্যা আছে। আমরা স্যার সরকারি চাকরি করি, আইন মান্যা চলতে হয়! ওস্তাদ শামসু মিয়াও গতকাল এসেছিল। জানায়া গেছে, আজ সে ইলিগ্যাল পজেশন উচ্ছেদ করতে যাচ্ছে। দলিলের কপি-টপিও দিয়া গেছে। আমার কাছে ফোর্স চাইছে, আমি দেই নাই। কোর্টের অর্ডার ছাড়া আমি ফোর্স দিতে পারি না।

তা হলে! আমার কী হবে ?

কোর্টের অর্ডার লাগবে। আপনি স্যার কেস করে দ্যান। কোর্ট অর্ডার দিলে সঙ্গে সঙ্গে ফোর্স পাঠায়া আমি সব কিছুর পজেশন আপনাকে নিয়া দেব।

কেস করবো! তার আগে আমি থাকবো কোথায় ?

তা না হলে এক কাজ করেন। কিছু লোকজন ভাড়া করে পাল্টা দখল করেন। পারবেন? ওস্তাদ তো খুব ঘাগু মাল।

তা হলে ?

চলেন! আপনাকে আগায়া দেই। অফিসারটি ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে বলে, আব্বাজান খুব ছোটোবেলার গল্প করতো। বলে ওই বাড়িতে লজিং না পেলে তো লেখাপড়াই শিখতে পারতাম না। না খায়া পঞ্চাশের না কিসের দুর্ভিক্ষে মারা যাইতাম। আপনাদের বাড়ির লোকজন তাকে বাঁচায়া দিছে। লজিং বাড়িতে থাকার নিয়ম আছে। যতোটুকু ভাত তরকারি দেয়, তুমি যদি পুরাটা না খেতে পারো, তবু থালা-বাটিতে রাখবা না, ফেরত দিবা না, চুপচাপ ফেলায়া দিবা। নাইলে পরের দিন তোমাকে কম দিবে। সব আব্বাজানের গল্প। আর একটা নিয়ম আছে। প্রত্যেকদিন দুধ দিলে দুধ খাবা। হঠাৎ একদিন দিলে খাবা না। বিড়ালে যদি দুধে মুখ দ্যায়, তখন লজিং মাস্টারের কপালে দুধ জোটে। হা-হা-হা। সব আব্বাজানের কাছ থাকিয়া শেখা।

আপনে যান। আমি ফোর্স পাঠাচ্ছি। আপনাদের জিনিসপাতির যেন ক্ষতি না হয়, লুটপাট না হয়, আমার লোক দেখবে। আর আমি ওস্তাদরে রিকোয়েস্ট করবো মিউচুয়াল-কম্প্রোমাইজ করতে। থাকেন দুইদিন বাইরে বাইরে। নিশ্চয় বাড়ি ছাড়ি দিবে। ক্যান দিবে না। ওস্তাদ ঘাগু লোক। কাঁচা কাজ সে কেন করবে।

আপনি কী বলছেন, আমি আজ আমার নিজের বাড়িতে উঠতে পারবো না!

জোর থাকলে পারবেন!

আপনাদের জোরই আমার জোর।

আমরা তো আইনের লোক। আইনের জোরই আমাদের জোর। আপনার মামলা করাই লাগবে!

ও। তাইলে যাই।

ভাইজান। শোনেন। আপনার শার্টের পকেটে তো ট্যাকা-পাইসা কিছু দেখি না। ঘুম থাকি উঠিয়াই দৌড় ধরছেন, বুঝতে পারি। চলেন আপনার বাসে উঠায়া দেই। নাইলে যাবেন কিসে!

না। লাগবে না। আমি হেঁটেই যাবো। কায়সুল বলে।

রাগ করিয়েন না। আমি আপনার উপকার ছাড়া অপকার করবো না। আমার নাম ইয়াকুব আলি। নামটা মনে থুবেন। শোনেন, ১০টা ট্যাকা ধার দেই নিয়া যান। এরপর তো আপনার আসা লাগবেই। ফেরত দিয়েন।

কায়সুল ১০ টাকা গ্রহণ করে।

প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম তালুকদার লোকটা সজ্জন প্রকৃতির, তবে স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। কায়সুল ঘর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেতরের ঘরে যান এবং স্ত্রীকে ডেকে নেন।

শোনো। আমাদের বাংলার প্রফেসর কায়সুল সাহেব খুব বিপদে পড়ছে। ওর নতুন বাড়িটা, ওই যে যেটার মিলাদের দিন তুমি-আমি দুইজন দাওয়াত খেলাম, ওস্তাদ শামসু মিয়া জবরদখল করে ফেলছে।

হায়! হায়! দেশের পিরিস্থিতি সত্য খারাপ।

কায়সুল সাহেবকে বলছি থানায় খবর দিতে। এখন ওনার বউ-বাচ্চা রাস্তায় পড়ে আছে। একটু খোঁজ নেয়া লাগে। তুমি কী বলো ?

নিশ্চয়। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বলো খোঁজ-খবর নিতে।

কিন্তু দুইটা মেয়ে মানুষ রাস্তায় কাঁদছে। একটাবার যাওয়া উচিত না ?

খবরদার। তুমি যাবা না। তার ওপর থানা পুলিশের কেস। জমিজমা নিয়ে গোলযোগ। খুন-খারাবি হতে পারে। খবরদার তুমি যাবা না!

কায়সুল সাহেব লোক ভালো। মিটিং-এ সবসময় আমার পক্ষে থাকে।

তা থাকুক। তুমি ভাইস প্রিন্সিপ্যালকে খবর দাও। উনি করেটা কী! ক্লাসও তো নেয় না শুনি। বসে থেকে থেকে ওনার তো পেটে চর্বি হয়ে গেছে। আবার ওনার বউকে দ্যাখো, কুচি দিয়া ড্রেস করে শাড়ি পরে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, কাজেই ঘর থেকে বের হন না। তিনি লোক মারফত খবর পাঠান ভাইস প্রিন্সিপ্যালকে। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল লোকটার জমজমাট টিউশনি। প্রিন্সিপ্যালের লোক মারফত যখন তিনি বিষয় ও আদেশ অবগত হন, তখনও তিনি তার বৈঠকখানায় ছয়জন ছাত্রের একটা ব্যাচ পড়াচ্ছিলেন। তিনি প্রিন্সিপ্যালের হাতে লেখা চিঠিটা পাঠ করেন। প্রিন্সিপ্যাল তাকে কী করতে বলেছে? তিনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু পত্রবাহক, যে প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে থাকে, আবার কলেজের পিয়নও, ঘটনার কিছুটা বিবরণ দেয়। তখন আরেকটা ব্যাচ টিউশনি থাকায় ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পক্ষেও অকুস্থলে গমন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আলাপের বিষয়বস্তু ছাত্ররা জেনে যায়। তখন পড়া শেষে ছাত্ররা যায় কায়সুল স্যারের বাড়ির সামনে। গিয়ে দেখতে পায়, স্যারের স্ত্রী ও শ্যালিকা ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্রের ওপর বসে আছে। তাদের চোখের অশ্রু শুকিয়ে চোখের নিচে ময়লা পড়ে

গেছে। আর লোকজনের ভিড়। এরই ফাঁকে একটা ছাগল কী একটা বই চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

আর স্যারের বাড়িতে দু'টো লোক সাইনবোর্ড টাঙ্গাচ্ছে। তাতে লেখা— শঠিবাড়ি ট্রাক শ্রমিক সমিতি। এই সম্পত্তির মালিক মোঃ শামসুদ্দিন মিয়া(ওস্তাদ)।

ছেলেরা তখন ঘটনা জানতে চায়। কয়েকজন গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক ছেলেদের এখান থেকে সরে যেতে এবং ঘটনার সঙ্গে না জড়াতে বলে। বলে যে, জমিজমার গণ্ডগোলে ছেলেপুলেদের জড়ানো অন্যায়। কারণ শামসু মিয়ার কাগজপত্র আছে। ক্রয়সূত্রে তিনিই এই সম্পত্তির প্রকৃত মালিক।

তখন ছাত্রদের খুব মায়া হয়। এই দুই অসহায় মহিলাকে ফেলে রেখে যেতে তাদের ইচ্ছা হয় না। এদের মধ্যে একজন শাহিন, তার একটা বিশাল বাসা (একতলা, উপরে টিন) আছে। শঠিবাড়ি গঞ্জেই সে একা সে বাসায় থাকে। আর থাকে মা। বড়ো ভাই থাকে মিডল ইস্ট।

সে তখন বলে, ভাবি, আপনারা এখন কী করবেন!

রেজিনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

এটে বসি থাকলে চলবার নয়। বেলা হইছে ১০টা। সকাল থাকি কিছু খাইছেন ?

আর খাওয়া! রেজিনা মুখ খোলে। টিউবওয়েলের পানিতে মুখটা পর্যন্ত ধুবার দেয় নাই। শখ কর‍্যা টিউবওয়েলটা বানালো তোমাদের স্যার। আরএফএল টিউবওয়েল। যেদিন কলটা বসায় কতো দোয়া পড়ছি। সুরা কাউসার পড়ছি ৫০০ বার। তারপর এই রকম পরিষ্কার পানি উঠছে। আয়রন নাই এক ফোঁটাও। সেই পানিত হাত দিবার দিল না। বাথরুম যাওয়া হয় নাই পর্যন্ত। শাহিন বলে, চলেন, হামার বাড়িত চলেন।

তোমার স্যার না আসলে ক্যামন কর‍্যা যাই।

কায়সুল তাড়াতাড়ি ফেরে। থানা অফিসার ইয়াকুব আলীর দেয়া ১০ টাকার ৯ টাকাই রয়ে গেছে। বাসে এবার আর তার কোনো অসুবিধা হয়নি, সংকোচও নয়।

রেজিনা বলে কায়সুলকে, কিছু হলো ?

না, হয়নি।

থানায় গেছলা! পুলিশের কাছে ?

হ্যাঁ।

পুলিশ কী বললো ?

পুলিশ কী বলবে! হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে কায়সুল। তার স্ত্রী নীরব হয়ে যায়। সাবিনাও কোনো কথা বলে না।

একটু পরে কায়সুলের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসে। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর মতো কার রাগ সে কার ওপর ঝাড়ছে। তখন কণ্ঠস্বরে মমতা ফুটিয়ে বলে, তোমরা তো হাত-মুখ

ধোওনি। কিছুই খাওনি। এইভাবে বসে থেকে কী লাভ!

শাহিন এতোক্ষণ চুপ করে ছিল। বলে, ছার, আমাদের বাড়িত চলেন ছার।

তোমার নাম যেন কী! শাহিন না!

জি ছার।

ছার, আমরা জিনিসপত্র পাহারা দিতেছি। আপনেরা চলেন বাড়িত। বড়ো বাড়ি। সব ঘর খালি পড়্যা থাকে। মা আপনাদের দেখলে খুশিতে নাচবে।

আচ্ছা। তুমি তোমার ভাবি আর আপাকে নিয়ে যাও। পুলিশ আসার কথা! আমি একটু পরে যাবো। এই তোমরা যাও।

রেজিনা আর সাবিনা শাহিনদের বাসার উদ্দেশে ছায়াকুঞ্জের সম্মুখভাগ থেকে রওয়ানা হয়।

একটু পরে তিনজন পুলিশ সাইকেলে চড়ে সেখানে হাজির। তাদের একজনের কাঁধে রাইফেল, অন্য দুজনের সঙ্গে লাঠি। তারা সাইকেল থেকে নামে। কায়সুলকে সালাম দেয়। বলে, ছার আপনের জিনিসপত্র সব ঠিক আছে তো!

ঠিক না থাকলে আপনারা কী করবেন ?

করবো! করবো তো বটেই।

কী করবেন ? ফায়ার করবেন!

না, ছার।

তাহলে ?

রিপোর্ট করবো ছার।

জিনিসপত্র সব ঠিক আছে। দেখেন না রেডিওটা বাজছেই।

তাইলে স্যার রিপোর্ট ভালো দেবো।

এখন আপনারা আমার জন্যে কী করতে পারেন ?

ছার। দুটো ভ্যান গাড়ি এনে দিই। জিনিসপত্র কোথাও সরিয়ে রাখেন।

জিনিসপত্র সরিয়ে রাখবো কেন ?

ছার ধরেন মামলা করে যদি জিতে যান, আবার সবকিছু ফেরত আনতে হবে না ?

ওস্তাদ শামসু আবার আসে মোটর সাইকেলে শব্দ তুলো। বলে, সে কী প্রফেসর সাব, মালপত্র সরান নাই ক্যান? সরায়ে ফ্যালেন। নইলে আবার আগুন লাগ্যা যাতে পারে। পুরো ঘর-দুয়ার জ্বল্যা যাতে পারে। জিনিসপত্রও ছাই হবার পারে।

আপনি কি ঘরে আগুন দিতে চান ? কায়সুল দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে বলে।

না। আমি না। ঝামেলা হলে ঝামেলা বাড়ে কি-না।

শোনেন। আগুন দেওয়ার দরকার নেই। আমি জিনিসপত্র সরাবো। তারপর মামলা করে মামলায় জিতে আমি আসবো। সত্যের জয় একদিন হবেই।

আমিও তাই কই। আলহামদুলিল্লাহ।

খানিক পরে শাহিন আবার আসে। বলে, ছার, আপাতত আমাদের দক্ষিণ দুয়ারি ঘরত সব কিছু পালা কর‍্যা থোন। পরে ছার আমরা ছাত্ররাই আপনার বাসা দখল কর‍্যা দেবো। চলেন।

ভ্যান গাড়ি ভাড়া করা হয় দুটো। পুলিশ খুব সহযোগিতা করে। প্রায় নির্বিঘ্নে কায়সুল ইসলাম চৌধুরীর বাসা বদল সম্পন্ন হয়। দু'টো ভ্যান। প্রতিটিকে দু'বার করে ট্রিপ দিতে হয়।

শেষ ট্রিপের সময় জিনিসপাতি কমই পড়ে ছিল। যা ছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু ছিল নির্মাণ সামগ্রী। মিস্ত্রি সাহেবের রেখে দেয়া দু'টো কর্নি, দু'টো লম্বাটে কাঠের টুকরো, বেশ কিছু লোহাও ভ্যানে ওঠে। এছাড়া টিনের কৌটা, হাঁড়ি-পাতিল, পুরনো জুতো, বদনা ইত্যাদিসমেত একটা ভ্যানে পিছন দিকে দুই পা ঝুলিয়ে কায়সুল নিজেই উঠে পড়ে।

ছায়াকুঞ্জ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তার মনে কোনো বিশেষ ভাব বা ভার অনুভূত হয় না। 'ছায়াকুঞ্জ' সাইনবোর্ডটা লেখার সময় কুঞ্জ বানানটা নিয়ে একবার সন্দেহ হয়েছিল, শুধু ন-য়ে জ নাকি ঞ-তে জ, আর হ্রস্ব উকার না দীর্ঘ-উ-কার, এই নিয়ে সন্দেহ। সেই কথাটাই বার বার মনে হয়। আর মনে হয়— এমনি একটা ঘটনা ঠিক তার জীবনেই ঠিক কবে যেন আরেকবার ঘটেছিল। তখনও ঠিক এসব কথাই পাক দিয়েছিল মনে।

রিকশাভ্যান এগোয়। এবার আকাশটা বেশ কালো হয়ে এসেছে। মনে হয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হওয়াটা দরকারও। যা গরম পড়েছে।

নতুন লাগানো সাইনবোর্ডটার দিকে চোখ পড়ে কায়সুলের। এই সম্পত্তির মালিক মোঃ শামসুদ্দিন মিয়া (ওস্তাদ)। ওস্তাদ। নিশ্চয় তুমি ওস্তাদ।

হঠাৎ তার নাকে বেলি ফুলের ঘ্রাণ আসে। তখন সে দূর থেকে দেখার চেষ্টা করে গোলাপের সদ্য কুঁড়ি গজানো ডালগুলোকে। ভালো মতো দেখা যায় না। বেড়ার আড়ালে পড়ে গেছে। তাহলে বেড়ায় লাগানো কাঁটা মেহেদীর গাছগুলোকেই সে দেখে না কেন? আচ্ছা, এই ঝোপ গাছের নাম কাঁটা মেহেদী কেন ? এদের গায়ে কি কাঁটা আছে নাকি! এতোদিন ভালো করে লক্ষ করাই হয়নি।

ভ্যান চালককে সে বলবে নাকি গাড়ি থামানোর কথা। না। দরকার কী! মায়া বাড়িয়ে লাভ কী! কিন্তু এই জংলিগুলো কি তার বাগানটার যত্ন ঠিক মতো করতে পারবে। গোলাপ খুব অভিমানী গাছ। যেখানে সেখানে হয় না। যার তার হাতেও হয় না। তাহলে কি এই কুঁড়িগুলো মরে যাবে!

যেদিন প্রথম খোদা বক্স মৃধা আর কায়সুল প্রথম এসেছিল এই জমিতে ভিত্তির দাগ কাটতে আর দড়ি ফেলতে, সেদিন কেমন জঙ্গল ছিল জায়গাটা। আর প্রথমবার কোদালের কোপ দিয়ে মনেই হয়নি এখানে একটা বাসা সত্যি সত্যি উঠতে যাচ্ছে। তারপর উঠলো তো।

মিস্ত্রি সাহেব বলেছিল, কাঁঠাল গাছটা কাটবেন না। কাটা হয়নি। আছে। আজো আছে।

ওই কাঁঠাল গাছটা। এখনো একটা বড়ো কাঁঠাল ধরে আছে ওপরের একটা দুর্গম ডালে। থাকুক! কে জানে কার পেটে যাবে।

হঠাৎ কায়সুলের খুব কান্না পায়। চোখের জল সে কিছুতেই আটকে রাখতে পারে না। ভ্যান তখন ছায়াকুঞ্জ ছেড়ে বেশ কিছু দূর চলে গেছে। দু'ধারে সবুজ ক্ষেত। ভ্যানের চাকা ঘুরছে, মনে হচ্ছে, পায়ের নিচ থেকে রাস্তাটাই পেছনের দিকে ছুটছে। কায়সুল সশব্দে কাঁদছে। ঠিক তখনই আকাশটা ভেঙে আসে বৃষ্টি। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে যায় কায়সুলের কান্না। সেই কান্না ধোয়া বৃষ্টিজল কতো দূর যাবে, কার সঙ্গে মিশে যাবে— কে জানে!

পৃথিবীতে কোন্ শোক আছে যে, তার সান্ত্বনা নেই! পিতার মৃত্যু, মাতার মৃত্যুর মতো অসহ্য শোক আর কী আছে! তাও তো সন্তান-সন্ততিরা মেনে নিয়েছে চিরকাল। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি বস্তু হলো পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ, সে অসহ্য ভারও কাঁধে বহে বেড়াতে হয়, তারপর সহ্যের পর্যায়ে নিয়ে আসতে হয়, এমন অভাগা পিতা-মাতাও তো সংখ্যায় কম নয়। প্রেমিকের কাছে প্রেমিকা কিংবা প্রেমিকার কাছে প্রেমিক হলো জান, প্রাণ, জীবন; একজন আরেকজনকে ছাড়া বাঁচবে না, এ কথা সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন সবচেয়ে বেশিবার উচ্চারিত সংলাপ, তবুও প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদের চেয়ে সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা দুনিয়ায় কী আছে? নিজের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও মানুষ হারিয়ে ফেলতে পরে, তুমি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, অর্থে-বিত্তে-খ্যাতিতে তোমার কোনো অভাব নেই, অসুখ নেই, ঘর থেকে নেমে কেবল তুমি গাড়িতে উঠছো, হঠাৎ কী হলো, পাশের ক্রীড়ারত বালকটির হাতে ফুটে উঠলো হাতবোমা; তোমার দু'টি হাত দু'টি পা কেটে ফেলতে হলো, গেলো চোখ দু'টোও, তারপরেও কি তুমি বেঁচে থাকতে চাইবে না, ভাতের সঙ্গে কাঁচা লংকা কিংবা টেবিলে প্রতিদিন তাজা ফুলের বিলাসিতা তুমি ছেড়ে দেবে!

জীবন এক নাছোড় জিনিস, সে তোমাকে ছাড়বে না। জীবন মানে জীবনের অতীত নয়, অতীতের মধ্যে মানুষ বাঁচে না, জীবন মানে বর্তমান সময়, মানুষ বাঁচে বর্তমানে; আর ভবিষ্যত ভালো হবে— এই আশা প্রতিনিয়ত তাকে সামনের দিকে টানে, প্রণোদনা যোগায়।

এখন কায়সুল আর রেজিনার জীবন মানে ছাত্র শাহিনের বাড়িতে আশ্রিতের জীবন। সাবিনারও তাই।

তাদের তিনজনের কাছেই এ-জীবনটিকে মনে হচ্ছে অস্থায়ী, নিতান্তই একটা অস্থায়ী

ব্যাপার; কায়সুলের-রেজিনার চিত্ত জুড়ে আছে তাদের ছায়াকুঞ্জ, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ওই বাড়ি হারানোর বাস্তবতাকে তাদের মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন, তারা নিশ্চিত ঘুম ভেঙে গেলেই এ দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে, তারা আবার হাসবে-খেলবে-ঘুরবে-ঘুমুবে ছায়াকুঞ্জেই। আর সাবিনার জন্যে ? বোনের বাড়িতে সে তো অতিথি মাত্র।

আগামীকালই সে চলে যাবে নিজ বাড়িতে।

এরই মধ্যে জীবন তার খাজনা ঠিকই বুঝে নিচ্ছে কড়ায়গণ্ডায়। বাথরুমে যাও, হাতমুখ ধোও, তারপর পেটেও কিছু দিতে হয়! শাহিনদের বাড়িটি সত্যি বিরাট, শঠিবাড়ির মতো জায়গায় এতো বড়ো বাড়ি বানানো কেবল মধ্যপ্রাচ্যের টাকার কল্যাণেই সম্ভব। একটা বাথরুমসহ তারই একটা রুমে উঠে গেলো তারা, আরেকটা রুমে তাদের সব জিনিসপাতি-আসবাবপত্র ঢোকানো হলো, আপাতত।

শাহিনের মা মহিলাটা খুবই সাদাসিধে এবং তার শরীর হলো দয়ার শরীর।

খালাম্মা তাদের জন্যে ঘিয়ে ভাজা পরাটা আর ডিম মামলেট দিয়ে বললেন, তোমরা তো নাশতাও করোনি। আগে নাশতা করো। তারপর গোসল-টোসল করে ভাত খাও।

তারা নাশ্‌তা করতে বসলে তিনি নিজে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। আরে করেন কী, করেন কী, বসেন না— বলেও তাকে নিবৃত্ত করা যায় না।

তিনি পাখা নাড়েন, আর বলেন, বাবারা, নিজের ছেলে পড়ে আছে বিদেশবিভুঁইয়ে, কখনো যদি তার বিপদ-আপদ হয়, কারো কাছে যদি সে যায়, তাহলে তারা তাকে সাহায্য করবে না। আমি তোমাদের বেদনা বুঝি বাবা। তুমি আমার নিজের ছেলের মতো। তুমি যতোদিন দরকার থাকো। দেশে কি আইন-কানুন উঠ্যা গেলো! নিশ্চয় তুমি তোমার বাড়ি ফির‍্যা পাবা বাবা। আমি দোয়া করি।

দুপুরে আবার শুরু হলো বৃষ্টি। ইলশাগুঁড়ি। খুব ঝমঝমিয়ে যে পড়ছে তা নয়। কিন্তু থামছেও না।

সাবিনা বললো, শাহিন ভাই, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। একটু শুন্যা যাবেন।

তারা গেলো বারান্দায়। বৃষ্টির ঝাপটা বাতাসের তোড়ে তাদের গায়ে এসে লাগছে। সাবিনার এলোমেলো চুলে-কপালে জলের মিহি কণা এসে জমছে।

শাহিন ভাই। আপনাদের কলেজের মতিন উদ্দীনক চেনেন ?

হ্যাঁ। চিনি। ও আমাদের ফ্রেন্ড হয়।

সে কোটে থাকে, জানেন ?

জানি।

ঠিকানাটা ভালো করে কন তো!

ক্যান?

কন না। দরকার আছে।

শাহিন ঠিকানা বলে দেয়।

রিকশাত যাওয়া যাবে ?

যাবে।

কয় মাইল দূর ?

তিন মাইল।

খানিক পরে বৃষ্টি একটু কমে আসে। কায়সুল বেরিয়ে পড়ে তার বাড়ি উদ্ধারের ব্যাপারে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে পরামর্শ করতে। সাবিনা তখন রেজিনাকে বলে, আপা, আমি একনা বারাচ্ছি। তুমি চিন্তা করিও না। এক ঘণ্টার মধ্যে আস্যা যাবো।

রেজিনার তখন শোধ-বোধ কোনো শক্তিই নেই। সে হ্যাঁ বলে না, নাও বলে না।

সাবিনা বেরিয়ে পড়ে। একা।

বিকেল বেলা। আকাশে ছড়ানো মেঘগুলো এখন পুঞ্জ পুঞ্জ আকার ধরে ভেলার মতো ভাসছে। বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র আকারে মেঘগুলো অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। সাবিনা একটা রিকশা ভাড়া করে। তালতলার ভাঙা ব্রিজের পরে মণ্ডলবাড়ি, যাওয়া-আসা ১২ টাকা ভাড়া। জোরে চালাবেন। রিক্‌শা চলতে শুরু করে। কাঁচা রাস্তা। প্রায়ই রিকশাঅলাকে সিট থেকে নেমে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

মণ্ডলবাড়ি পর্যন্ত রিক্‌শা যেতে পারে না। একটা কালভার্ট বসে গেছে, ওই জায়গাটা পার হতে হয় বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে। সাবিনা তাই করে। সার্কাসের মতো ব্যালান্স করে করে সাঁকোর ওপারে যায়। বাকিটা পথ তাকে হেঁটে যেতে হবে। সাঁকোর অন্য পাড় থেকে সে বলে, রিকশাঅলা, আপনে থাকেন। আমি এখনই আসতেছি।

রিকশাঅলা সম্মতি দেয়। যান বাহে। চিন্তা নাই। মুই আছোম।

মণ্ডলবাড়ি সামনেই দেখা যায়। রিকশাঅলা তাই বলেছে। মতিনকে কি পাওয়া যাবে ? সে যদি বাড়িতে না থাকে, তা হলে! চিঠি লিখে দিয়ে আসতে হবে! ওদের বাড়িতে যদি কাগজ-কলম না থাকে! মতিন তাকে দেখলে কি আশ্চর্য হবে!

আহা। আসার আগে একটু সেজে-গুজে এলেই হতো। চুলটা পর্যন্ত আঁচড়ানো হয়নি। একটা ভালো জামাও তো পরা হলো না।

বাড়ির কাছাকাছি হতে বুক কাঁপতে থাকে সাবিনার।

কতোগুলো বাচ্চা ছেলে, তাদের খালি গা, তারা একটা ন্যাকড়ার বলে লাথি দিতে দিতে এদিকটাতে ছুটে আসে। তারা সাবিনাকে দেখে ছড়া কাটতে থাকে— এই ছেড়ি তোর নাম কী, নাম দিয়া কাম কী! সাবিনা ওদের মধ্যে একটা ছেলেকে ধরে ফেলে। সে কেঁদে শরীর বাঁকিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়। সাবিনা বলে, তোমার নাম কী!

সে কথা বলে না।

মতিনকে চিনো।

সে জবাব দেয় না।

মতিনকে ডাক্যা দিবার পারবা ?

হ।

ছেলেটার বয়স তিন কি চার বোঝা যায় না। খালি গা। কুচকুচে কালো শরীর। নাকের নিচে সর্দি।

যাও। মতিনকে এই জাগাত ডাক্যা নিয়া আসো।

ছেলেটা রাজি হয় বলে মনে হয়। কিছুদূর গিয়ে সে প্যান্ট নামিয়ে তার ছেলেত্বটুকুন দেখিয়ে চম্পট দেয়। অন্য ছেলেমেয়েরা খিলখিল করে হাসতে থাকে।

সাবিনার কান্না পায়। শিশুরা এতো নিষ্ঠুর হয় কেন ?

কিন্তু মতিন উদ্দীন আসে। বলে, দূর থাকি আপনাকে দেখল্যাম। দেখি মনে হলো, চেনা চেনা। তাই আল্যাম। আপনি এদিকে কী মনে করিয়া।

সাবিনা তাকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। বলে, আপনার কাছে আল্যাম দরকারে। খুব জরুরি কথা আছে।

চলেন। গরিবের বাড়ি আসছেন। চলেন। বসিয়া তারপর বলেন, কী জরুরি কথা।

মতিন একথা বলে বটে, কিন্তু তার শরীর ভীষণভাবে প্রকম্পিত হতে থাকে! কেন এসেছে সাবিনা তার কাছে! তবে কি সাবিনাকে নিয়ে তার স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে!

আসলে প্রথমদিন সিনেমা হল থেকে ফেরার পথে তার সঙ্গে এই মেয়েটির সেই যে দৃষ্টিবিনিময়, তাতেই একটা কিছু ঘটে গিয়ে থাকবে। মানুষের চোখ হলো মনের দর্পণ। চোখের সঙ্গে চোখ পড়লেই তো হয় না, মনের সঙ্গে মনের একটা মিলে যাওয়ার ব্যাপারও হয়তো থাকে। চোখে চোখ তো কতোই পড়ে, সব দৃষ্টিবিনিময় তো একই সংবাদ বহন করে না। কিন্তু কখনো কখনো এমন হয়, তুমি কারো চোখে তাকাতেই বুঝতে পারছো, কোথায় একটা দেওয়া-নেওয়া ঘটে যাচ্ছে।

আর এই বয়সটাও তো একটা ব্যাপার। ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়, এতো এক ভয়ঙ্কর উচাটন সময়। তখন আকাশে চাঁদ উঠলে মনে হয়, এতো আমার জন্যে উঠেছে, যেহেতু আমি আর ওই চাঁদ বড়ো একা, বাতাসে ভ্রমর গুনগুন করলে মনে হয়, আহা, আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে।

গত ক'দিন ধরেই মতিনের শয়নে-স্বপনে-নিদ্রায় এবং প্রধানত অনিদ্রায় সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু এক নাম— সাবিনা, শুধু এক মুখ— সাবিনার মুখ! সে কোনোদিন কবিতা লেখেনি, কিন্তু এখন সে সাবিনাকে নিয়ে কবিতাও লিখেছে কয়েকটা। এরমধ্যে একটা হলো—

আমার সাবিনা
একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল
আমার সাবিনা
আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবি না।

এই লাইনটা রচিত হওয়ার পেছনে আশু কারণ হলো গত এসএসসি পরীক্ষায় নকল সরবরাহ করতে সে সেন্টারে গিয়েছিল। প্রশ্নপত্রে ছিল 'আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল' লাইনটার 'ব্যাখ্যা লিখ'। এটা একটা নোট বই থেকে কপি করে মতিন

জনৈক পরীক্ষার্থীকে সাপ্লাই দিয়েছিল।

এ ছাড়াও সে সাবিনাকে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু চিঠি লিখেছে। এই চিঠিগুলো কীভাবে সাবিনার হাতে সমর্পণ করা যায়, এই নিয়েও সে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তিত ছিল।

এখন জ্বলজ্যান্ত সাবিনা তার সামনে। আর আকাশে কনে-দেখা হলদে আলো।

সেই হলদেটে আলো পড়েছে সাবিনার মুখে। তার এলায়িত চুল, এক গোছা এসে পড়েছে মুখের ওপর, অপূর্ব আলো পড়ে তাকে মনে হচ্ছে এক সোনা দিয়ে বানানো ভাস্কর্য।

তখন মতিনের মনে হয় সবচেয়ে জরুরি সংলাপটি, আপনার কথা শোনার আগে আমি একটা কথা কতে চাই। আমরা কিন্তু খুব গরিব।

এই কথা কচ্ছেন ক্যান ?

না। কয়া থুলাম আর কী!

এ কথা পরেও শোনা যাবে। আমি খুব সমস্যার মধ্যে আছি। আপনার স্যারের খুব বিপদ।

বিপদ। কী হইছে, কন তো শুনি।

মাটির উঁচু রাস্তায় তারা দাঁড়িয়ে। দুই ধারে ধেনো জমি বর্ষার পানিতে কানায় কানায় পূর্ণ।

দুলাভাইয়ের বাসা বেদখল হয়া গেছে। বুঝছেন।

না। বুঝি নাই। বুঝায়া কন।

আজ ভোরবেলা ওস্তাদ না টোস্তাদ শামসু মিয়া আস্যা বাড়ি ঘর দখল কর‍্যা ফ্যালাছে। জিনিসপাতি সব বার কর‍্যা দিয়া কচ্ছে বলে এই সম্পত্তি আমার।

কন কী! আমি তো কিছুই বুঝতেছি না।

ওই যে সিনেমা হলের ঘটনা। তারই জের ধর‍্যা তারা এই কাজ করলো। আপনেরা যে খুব মাইর দিছিলেন। সেটাই তাদের আঁতে ঘা দিছে।

তাইলে এখন ?

আমরা গিয়া আপনাদের ফ্রেন্ড শাহিনের বাসাত আপাতত উঠছি। শাহিনই আপনের ঠিকানা দিলো।

ও।

এখন আপনেরা কিছু একটা করেন। মতিন ভাই, আমি জানি, আপনে পারবেন। আপনে আমার প্রেস্টিজ বাঁচান। আমার জন্যে আপা-দুলাভাইয়ের এই সর্বনাশ। এখন আপনে ছাড়া আমার দুঃখ কে বুঝবে!

ঠিক আছে। আমি, সোহরাব, বাবুল, ডাব্লু, গনিক নিয়া আসতেছি। দেখি, কার বাপের ক্ষেমতা আছে কায়সুল ছারের বাড়ি দখল করে।

তাইলে আমি যাই।

একলা যাবেন ?

তাছাড়া আর উপায় কী!

চলেন। আমি আপনাকে কিছু দূরে আগায়া দিয়া আসি।

না।

না ক্যান।

এক রিকশাত ওঠা ঠিক হবার নয়। লোকজন খারাপ কথা কও -বলা করবে।

না, এক রিকশাত যাবো না। সামনে সাইকেলের মেকারের দোকানত আমার সাইকেল আছে। নিয়া নেবো। আপনে যাবেন রিকশাত। আমি সাথে সাথে যাবো সাইকেল চালায়া।

আচ্ছা, চলেন তাইলে।

সাবিনা যে পথে এসেছে, সেই পথেই ফিরতে থাকে। এবার অবশ্য সঙ্গে আছে আরো একজন, সেই লম্বা চুলের নীল শার্ট যুবক। এবারও তার পরনে নীল শার্ট, তবে পরনে লুঙ্গি। তারা সেই বাঁশের সাঁকোটা পার হয়।

একটা বাঁশের সাঁকো, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, আকাশে লাল, বেগুনী, কমলা, গোলাপী মেঘ, একটা সবুজ রাস্তা, মধ্যখানে ভাঙা কালভার্ট, সেই জায়গা দিয়ে কল্‌কল করে ছুটে চলেছে জল, তার ওপরে বাঁশের সাঁকো, সাঁকোতে দুই জন মানব-মানবী, তারা সাঁকো পেরুচ্ছে, একটি মাত্র বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো। সাবিনা সামনে, পেছনে মতিন। সাবিনা খুব ধীরে পেরুচ্ছে বলে অভ্যস্ত মতিন তার নিত্যদিনের গতিতে চলতে পারছে না।

কিন্তু সাঁকোর এ পাড়ে এসে দেখা গেলো, রিকশাও নাই, রিকশাঅলাও নাই। আসা-যাওয়া ১২ টাকা ভাড়া ধার্য হয়েছে, অন্তত ৬ টাকা তো তার পাওনাই, এই আকালের বাজারে ছয় ছয়টা টাকা না নিয়ে ব্যাটা কোথায় গেলো ?

নিশ্চয় রিক্‌শা জমা দেওয়ার টাইম পার হয়া যায়। নাইলে কারো সাথে হাটত যাওয়ার চুক্তি আছে। রিকশাঅলারা সবায় মণ্ডলবাড়ি চিনে। পরে আসিয়া ভাড়া নিয়া যাবে নিশ্চয়। খাড়ায়া থাকিয়া লাভ নাই। চলেন। হাঁটেন।

তারা আরেকটু বড়ো রাস্তায় এলে একটা বটগাছের নিচে দু'টো দোকান দেখা যায়।

সেখানেই সাইকেলের মেকারের দোকানে মতিনের সাইকেল রাখা। মতিন তার সাইকেল নেয়।

ইতিমধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে। রাস্তার দুই ধারের জলাশয়ে জোনাকি পোকা জ্বলছে নিভছে। ব্যাঙ ও ঝিঁঝি ডাকছে বেশ জাঁকিয়ে। অন্ধকার পথে সাবিনা আর মতিন হাঁটছে। মতিনের হাতে সাইকেল।

এ ক্যামন রিক্‌শাঅলা। প্যাসেঞ্জার থুয়া পালায়। সাবিনা বলে।

সমস্যা তো! আর কোনো রিক্‌শাও তো দেখি না। মতিন উদ্বেগের স্বরে বলে।

তারা আস্তে আস্তে হাঁটে। বর্ষাবিধৌত রাস্তায় চলাটায় ঠিক ছন্দ ফোটে না। তখন আকাশে দেয়া ওঠে ডেকে। বিজলি আলোয় দেখা যায়, সারাটা আকাশ ঢেকে আছে মেঘে।

সাবিনা ভয় পায়। বলে, দেরি হয়া যাইতেছে। বাড়িত বুবু আর দুলাভাই নিশ্চয় চিন্তা করতেছে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়। তখন সাবিনা কেঁদে ফেলে। বলে, আপনে সাইকেলের সামনে আমাকে নিতে পারিবেন ?

পারবো।

নেন তাইলে। আন্ধারে কেউ দেখবার পারবে না। সামনে রিকশা পাইলে নিয়া নিব।

সাবিনা মতিনের কাছে যায়। বলে, ন্যান, তোলেন। মতিন শক্ত করে ডান হাত দিয়ে হ্যান্ডেল ধরে। বলে, ওঠেন। সাইকেলের সামনের রডে চড়ার অভ্যাস সাবিনার নতুন নয়। সে উঠতে পারে। তখন মতিন বিসমিল্লা বলে সাইকেল ঠেলে কয়েকধাপ দৌড়ে ডান পা সিটের ওপর দিয়ে তুলে সিটে উঠে পড়ে। তার বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হয়। অন্ধকার। রাস্তা তেমন দেখা যায় না। আন্দাজে চালাতে হয়। তার ওপর তার এতো কাছে একজন পরিপূর্ণ মানবী, তার হাত মতিনের হাতে লাগছে। মতিনের বুক লাগছে তার পিঠে। আবার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। বিদ্যুতের আলোয় সে স্পষ্ট দেখে সাবিনার নগ্ন গ্রীবা আর কাঁধ। উন্মুক্ত পিঠের কিছুটা। তার নিঃশ্বাস ঘন আর গরম। সে কোনো কথা বলে না।

টিপটিপ বৃষ্টিতে সাবিনার চোখ-মুখ ভিজে যায়। মতিনেরও। সাবিনা তার ডান হাতটা মতিনের ডান হাতে রাখে। আস্তে আস্তে নেড়ে দেয়।

আশ্চর্য! সাবিনা সকালবেলাকার অপমানের জ্বালা ভুলে যায়। তার খুব ভালো লাগছে। সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন ঝিমধরা অনুভূতি।

জীবন অত্যন্ত নাছোড় ব্যাপার।

মতিন সামনের দিকে এগিয়ে বসে। তার পা সাবিনার গায়ে লাগছে। সাবিনা সরছে না। নিষেধ করছে না। বৃষ্টির ধারা প্রবল বেগে বইতে থাকে। প্রবলতর বেগে।

কায়সুল ইসলাম চৌধুরী, লেকচারার শঠিবাড়ি কলেজ, অধিক পরিচিত প্রফেসর হিসেবে, নিজের বৈধ নিষ্কন্টক জমি আর তাতে নিজ হাতে গড়ে তোলা বাসাটি পুনরুদ্ধারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে রংপুর শহরে চলে আসে। শঠিবাড়ি থেকে রংপুর মাইল পঁচিশেক দূর বইতো নয়, বাসে উঠলে এক ঘন্টার মতো লাগে। রংপুর শহরে সে আসে আজিজার রহমান উকিলের কাছে। এই নামটি তাকে দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল স্যার নিজে। তার দুঃসম্পর্কের ভায়রা নাকি হয়। প্রিন্সিপ্যাল স্যার একটা চিঠিও দিয়েছেন সঙ্গে।

সেই চিঠি নিয়ে বিকাল বেলা, কায়সুল বসে আছে এডঃ আজিজার রহমানের মুন্সিপাড়ার বাসায়, বাইরের বৈঠকখানায়। কায়সুল নিজের এই বিপর্যয়ে মোটেও ভেঙে পড়েনি, লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুন্সিপাড়ার আজিজার উকিলের এই বৈঠকখানায় বসে দেওয়াল জোড়া আলমারির তাকে তাকে সজ্জিত চামড়ায় বাঁধা মোটা মোটা বইয়ের দিকে তাকিয়ে কায়সুল নিজের অন্তরের ভেতর থেকে শুনতে পায় অভয়বাণী– সত্যের জয় একদিন হবেই।

সত্যের জয় একদিন হবেই, এ কথাটা সে প্রথম কবে শুনেছিল? মনে পড়ে স্কুল থেকে পালিয়ে তারা একবার গিয়েছিল গাইবান্ধা শহরে, সিনেমা দেখতে। কী সিনেমা, এখন আর মনে নেই, কিন্তু পরদিন তাদের ক্লাসের স্যার তাদের সবাইকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, সিনেমা দেখাও খারাপ না। সিনেমা থেকেও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। বলো, গতকালকের সিনেমা দেখে তোমরা কী উপদেশ পেয়েছ?

সবাই ছিল নিরুত্তর। একজন বলে, স্যার, আমি বলব।

বল।

স্যার, সত্যের জয় একদিন না একদিন হবেই। মিথ্যা চিরদিন টিকে থাকতে পারে না।

বস। আর যে যে বলতে পারবে, সে সে বসতে পারবে।

একই কথা— সত্যের জয় একদিন হবেই হবে; মিথ্যা চিরটাকাল টিকে থাকতে পারবে না— নানাভাবে বলে-টলে সবাই বসার অনুমতি জুটিয়ে নিয়েছিল।

কায়সুলও।

স্যার বলেছিলেন, একই কথা আমি তোদের মুখ থেকে বার বার কেন শুনলাম। ভাবছিস, খুব ফাঁকি দিলি স্যারকে। না-রে। এই সত্য কথাটা বার বার না শুনলে নিজেরই কেমন সন্দেহ হয়। স্যার উদাস হয়ে গিয়েছিলেন।

এ বৈঠকখানাটি বেশ পুরনো। একটা বড়ো টেবিল। তার একদিকে একটা লম্বা গদিঅলা চেয়ার। চেয়ারে একটা অতি পুরাতন তোয়ালেও লক্ষ্য করা যায়। টিনের চালের নিচে চাটাইয়ের ছাদ। সেটা এতো পুরনো যে, প্রায় কালো। আর তাতে ঝুলকালি। বেঞ্চ কাম চেয়ার। অর্থাৎ, হাতলঅলা বেঞ্চ। তাতেই বসেছে কায়সুল। আরো তিন-চারজন লুঙ্গি পরা লোক আরেকটা বেঞ্চে বসা। একটা ফ্যান আছে। খুব পুরনো (সম্ভব বৃটিশরা ভারতে আগমনের সময় এই ফ্যান সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল)। ফ্যানটা ছেড়ে দেওয়া। ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে শব্দ হচ্ছে। তবে বাতাস হচ্ছে কিনা, বলা মুশকিল। টেট্রনের শার্টের নিচে কায়সুল কুলকুল করে ঘামছে। ভাবছে, যতো গর্জে ততো বর্ষে না প্রবাদটা কি এই ধরনের ফ্যান সম্পর্কে বলা হয়েছিল।

এর আগে কায়সুল কোনো দিন উকিলের কাছে যায়নি। নতুন কোনো জায়গায় যেতে তার বেশ সংকোচ। ব্যাপারটা সে প্রিন্সিপ্যাল স্যারকে বলেছে। পাশে তার স্ত্রী ছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল স্যারের ওয়াইফ বললেন, ভাইটি, আগে কোনোদিন বিয়া করো নাই বলে কি বিয়া করতে যাইতে ভয় লাগছে। পুরুষ মানুষের মতো কথা বলেন। দুলাভাইকে আপনার স্যার চিঠি লিখ্যা দিছে। আর কোনো চিন্তা নাই। চিঠি নিয়া রংপুর যান, সোজা

মুন্সিপাড়াত।

কথা তো সত্য। বিয়ে করার আগে সে কোনো দিন বিয়ে করেনি, জন্ম নেবার আগে কোনোদিন জন্ম নেয়নি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে কোনোদিন ভর্তি হয়নি।

এইসব বিষয় নিয়ে সংকোচ করার কোনো মানে হয় না।

আধঘণ্টা পর এলেন আজিজার রহমান উকিল। সিনেমায় দেখা আদালতের উকিলের মতো দেখতে নন তিনি। পাঞ্জাবি-পাজামা পরা, থুতনিতে কিঞ্চিত দাড়িও আছে। তার চেয়ারে যখন তিনি বসলেন, তখনই বোঝা গেলো যে, ইনিই তিনিই।

কায়সুল তাড়াতাড়ি করে উঠে উকিল সাহেবের সামনে যায়— স্লামালেকুম, আমি শঠিবাড়ি কলেজের লেকচারার, প্রিন্সিপ্যাল স্যার চিঠি দিয়েছেন।

ও! বসেন। কেমন আছেন উনি। তিনি চিঠি খুলে চশমাটা খুঁজতে থাকেন। পকেট হাতড়ে খাপ বের করে চশমাটা চোখে পরেন।

হুঁ। জায়গা-জমি বেদখল হয়ে গেলো। মগের মুল্লুক কায়েম হয়ে গেছে। দ্যাও। রাজাকারদের ভোট দ্যাও। তিনি নিজে নিজে বিড়বিড় করেন। একটা ছোটো মেয়ে, পরিচারিকাই হবে, তাকে পেষা পান একটা পিরিচে দিয়ে যায়। তিনি পান মুখে পোরেন। এখন কী করবেন, ঠিক করেছেন ?

না। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। আপনি কী বলেন ?

দখল রাখতে পারলে ভালো হতো। মারামারি করতে পারবেন ?

না। সিনেমা হলের টিকেট ব্লাক করে লোকগুলান। তাদের নেতা। ওদের সাথে কি পারবো ?

পারবেন না কেন ? ছাত্র আছে না কলেজে ? ছাত্র লাগায়া দ্যান।

ওস্তাদ শামসু বদমাশগুলোর লিডার। লোক ভালো না। শঠিবাড়িকে স্মাগলিঙের সেন্টার বানিয়ে ফেলেছে। সে আবার ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের লিডার।

ও। কালা শামসু। ওর তো এক পা ছোটো, না ?

হ্যাঁ।

ওতো বিশ্ব বদমাইশ। থানা পুলিশ কিনে রাখছে নিশ্চয়।

এখন সরকারি পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

হ্যাঁ জানি— উকিল সাহেব ছেঁচা পান চিবোন, তার গালসি বেয়ে লাল রস কিঞ্চিত উঁকিঝুঁকি মারে— নেক্সট টার্মে ইলেকশান করতে চায়। বড়ো মুশকিল। দেশে ল' এন্ড অর্ডার নাই।

আমি এখন কী করবো ?

পিটিশন করি। অসুবিধা নাই। আল্লাহ ভরসা। প্রিন্সিপ্যাল ভাইজান যখন লিখে দিয়েছেন, আমি দেখবো। আমি লড়বো। আই উইল ফাইট ফর ইউ। আই উইল ফাইট ফর দি ট্রুথ।

থ্যাংক ইউ।

কাগজপত্র আনছেন। দলিলপাতি, পর্চা, দাখিলা।

জি। আনছি।

খাজনা দিয়েছেন দেখছি।

জি।

খাল কাটতেছে না। খাল কেটে কুমির আনতেছে। মগের মুল্লুক। আচ্ছা। আমার জুনিয়র উকিল সাহেব এখনই এসে পড়বে। তারে সবটা খুলে বলেন। লড়বো। আই উইল ফাইট ফর দি ট্রুথ, আই উইল ফাইট ফর ইউ মিস্টার প্রফেসর।

এবার আর কায়সুল ঠিক করে দেয় না যে, সে প্রফেসর নয়। বরং তার মনে হয় সত্যের জয় একদিন না একদিন হবেই।

জুনিয়র উকিল সাহেব আসেন। তিনি সত্যি সত্যি জুনিয়র। বয়স ত্রিশ কি বত্রিশ। তার নাম পরে জানা যায়, এডভোকেট নজরুল ইসলাম। তিনি পৌরসভা নির্বাচনে কমিশনার পদে গোলাপ ফুল মার্কায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং অল্পের জন্যে হেরে যান। সেই থেকে তার নাম গোলাপ উকিল হয়ে গেছে। এ বিষয়ে তার একটি বহুল উদ্ধৃত সংলাপ হলো, ভাই, প্রথমে তো গাভী মার্কা পেয়েছিলাম, ভাগ্যিস নেই নাই। তাইলে তো লোকে আমাকে গাই উকিল বলে ডাকতো।

গোলাপ উকিল ঘরে ঢোকেন কৈফিয়ৎ মুখে নিয়ে। বলেন, স্যার, একটু দেরি হয়ে গেলো, রাস্তায় মুরগি কিনতেছিলাম, আরে খালি ভূষি খাওয়াইয়া এক পোয়া মুরগিকে একসের বানাইছে, আবার সের চায় ২৮ টাকা।

এডঃ আজিজার রহমান বলেন, এডভোকেট সাহেব এই মক্কেলের সাথে একটু কথা বলেন। ভদ্রলোক বহুত পেরেশানির মধ্যে আছেন।

গোলাপ উকিল কথা বলে কায়সুলের সঙ্গে। কায়সুল ঘটনার বিশদ বিবরণ দেয়। গোলাপ উকিল মন দিয়ে শোনে। কাগজপত্র সব উল্টে-পাল্টে দেখে। তারপর বলে, ঠিক আছে, আর্জি রেডি করে ফেলবো। কোর্ট ফি, ওকালতনামার ফি এইসবের খরচ আছে। খুবই সামান্য খরচ। আর মুহুরিকে দিতে হবে কিছু লেখাই খরচ। কিছু টাকা দিয়া যান।

কতো দেবো ?

গোলাপ মিয়া কাশি দেয়। আজিজার উকিল তাকান, বলেন, প্রফেসর সাহেবের কেসটা আমি সত্যের খাতিরে ফাইট করতে চাই। প্রিন্সিপ্যাল ভাইজান আমাকে অনেক কেস দিছেন। এই কেসটাতে, গোলাপ মিয়া দেখেন, কতো কম টাকা খরচ করা যায়।

শুনে কৃতজ্ঞতায় কায়সুলের অন্তরটা নুইয়ে আসে।

আপাতত তিনশ' টাকা দ্যান তাহলে। পিটিশন ফাইল করানোর জন্যে আরো কিছু খরচ পাতি আছে। পেশকার, সেরেস্তাদার, ধরেন যে পিয়ন সিল মারে, তাকেও চায়ের খরচটা, পানের খরচটা না দিলে তো ডেটই পড়বে না। গোলাপ উকিল বুঝিয়ে বলে।

তাহলে কি আরো টাকা দিয়ে রাখবো ?

না। থাকুক আপাতত। আল্লাহ ভরসা। ডেট পড়লে কিছু টাকা লাগবে। রেডি করে রাখবেন।

আচ্ছা।

কিছু কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় কায়সুলকে। তারপর সে ওঠে। দুইদিন পর আবার সে আসবে, এই কথাই ফাইনাল হয়।

কায়সুল উকিল সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর পথ হাঁটে। তখন তার মনে হয় যে, উকিল সাহেবের চেম্বারে সে তার হাতব্যাগ ফেলে রেখে এসেছে। সে উল্টোমুখে দৌড় ধরে। ঘরের সামনে এসে সে ইতস্তত করে। এই ঘরটাই তো। পিছিয়ে গিয়ে সাইনবোর্ড পড়তে হবে। এমন সময় সে শুনতে পায় আজিজার উকিল আর গোলাপ উকিল কথা বলছেন—

স্যার। শঠিবাড়ির প্রফেসরের কেসটা কি স্যার আপনি জেনুইনলি ফ্রি অফ চার্জ ফাইট করতে চান।

অফ কোর্স ইয়েস। পাইছে কী। ব্যাটা রাজাকাররা। ক্যান্টনমেন্টের দালালেরা। দেশে আইন-কানুন নাই। একটা পয়সা নেবো না। তবু শালা এই কালপ্রিটগুলোর হাত থেকে শান্তিপ্রিয় সিটিজেনদের সেভ করবো। অফ কোর্স।

শুনে কায়সুল বুকে সাহস ফিরে পায়। মনটাও তার ভালো হয়ে যায় অনেক। সে শব্দ করে কাশে এবং ঘরে ঢোকে।

আমার ব্যাগ। সে ব্যাগটা নেয় এবং পুনরায় দু'উকিলকে সালাম করে।

সে রাতে তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে মতিন বাড়ি পৌঁছে দেয় সাবিনাকে। বাড়ি তো নয়, শাহিনদের বাসা। শঠিবাড়ি গঞ্জে পৌঁছার বেশ আগেই খালি রিকশা পাওয়া যায়। তাই দেখে মতিন বলে, সাবিনা, খালি রিকশা দেখা যায়, ডাক দেব।

মুখ ফিরিয়ে সাবিনা বলে, না, দরকার কী। তার বৃষ্টিভেজা নাসাগ্র ও ঠোঁট নড়ে, রাস্তার আলোয় মতিন দেখে। তখন মতিন ইচ্ছা করে ঘুরপথে যায়, অন্তত মিনিট দশেক অতিরিক্ত চালায় এবং অবশেষে রাত অধিক হয়ে পড়লে বিপদ হবে ভেবে শাহিনের বাসার হাত দশেক দূরে সাবিনাকে নামিয়ে দেয়। সাবিনা নেমেই ঘোর কেটে যাওয়ায়, দৌড়ে শাহিনদের বারান্দায় গিয়ে ওঠে।

মতিন সাইকেল ঘোরায়। সে, ওই তুমুল বৃষ্টির ভেতরেই— তার শরীরে ও মনে সাবিনার উষ্ণতা ও সৌরভ— তার সব ক্লাসফ্রেন্ডের কাছে যায়। সোহরাবকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। তবে বাবুল, ডাব্লু আর গনিকে পাওয়া যায় যার যার বাড়িতেই। সবাইকে মতিন গরম খবরটা দেয়। সিনেমা হলের কালোবাজারিদের হয়ে ওস্তাদ শামসু যে ভয়াবহ একটা অন্যায় করেছে, এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত, তারা একমত হয়। কিন্তু সোহরাব না থাকায় আর আবহাওয়া খারাপ থাকায় ওই রাতেই একটা কিছু না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। মতিন বাসায় যায় এবং কাপড়-চোপড় পাল্টে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার ঘুম হয় না। বিছানায় সারারাত সে ছটফট করে এবং সাবিনাকে নিয়ে সারারাত ফ্যান্টাসিতে ভোগে। এতো কাছে পেয়েও সে কেন আরেকটু বেশি আদর করলো না, এ ধরনের চিন্তা মাথায় আসতে চাইলে সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিবৃত্ত করে। কেননা, সাবিনাকে সে ভালোবাসে এবং তাদের ভালোবাসা অত্যন্ত পবিত্র।

শেষ রাতের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়ে এবং পরদিন সকাল দশটায় বাড়ির লোকজন যখন তাকে ডেকে তোলে তখন তার সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে ঘোরতর জ্বরে। সে চোখ খুলতে পারে না, যখন খোলে, যেন দল মেলে দুটো জবা, সে মাথা তুলতে পারে না। এ অবস্থায় জ্বরের ঘোরে, কিংবা ভালোবাসা, যা পৃথিবীর ভয়াবহতম জ্বর বিশেষ, তার ঘোরে, সে বার বার সাবিনা সাবিনা করতে থাকে।

সে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। উঠলেই সমস্ত দীন-দুনিয়া চক্কর দিয়ে ওঠে, বমি পায়।

আর এখন বাইরে, রিকশাঅলা শম্ভুর বয়ান মোতাবেক এ কাহিনী ছড়িয়ে যায় যে, মতিন উদ্দীনকে পরীতে ধরেছে। এ পরী শম্ভুর রিকশাতেও উঠেছিল। সে মণ্ডলবাড়ির সামনের ভাঙা কালভার্টের অন্য পাশে নামে, তারপর সাঁকো পার হয়। এরপর রিকশাঅলা চোখের পলক ফেলতেই সে তার হাত প্রসারিত করতে থাকে, আর একটানে মতিন উদ্দীনকে ঘর থেকে টেনে গাছতলায় নিয়ে আসে।

এই দৃশ্য দেখার পর রিকশাঅলা শম্ভু পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু মতিন উদ্দীন পালাতে পারেনি। অনেকেই একথা স্বীকার করে যে, একটা পরীকে সাইকেলে বসিয়ে বর্ষার রাতে মতিনকে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

এরপর এ কাহিনীর শাখা-প্রশাখা বিস্তারলাভ করতে থাকে, নানাভাবে কাহিনী পল্লবিত হয়ে ওঠে। মতিনকে যে পরী সোনার ঘড়া দিয়ে গেছে— একথাও শোনা যায়। আর এখনো রোজ রাতে পরী এসে মতিনকে ধরে নিয়ে শিমুল গাছের মগডালে তোলে আর ভোররাতে ফের তার ঘরে দিয়ে যায়— সে ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হয় না।

শুধু মতিনকে একজন ডাক্তারকে দেখানোর কাজটা কেউ করে না। মসজিদের ইমাম সাহেবের পড়া পানি, শঠিবাড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে কেনা মসিবত-নাজাত তাবিজ-কবজ সবই মতিনের ওপর প্রয়োগ করা হতে থাকে।

দীর্ঘ ২১ দিন রোগ ভোগ করার পর মতিন বিছানা থেকে কোনোমতে উঠে দাঁড়াতে পারে। তখন তার জন্যে ভাত আর মাগুর মাছের ঝোল রাঁধা হয়। তার মা যখন তাকে চামচ দিয়ে

এই নরম ভাত আর ঝোল খাইয়ে দিচ্ছিল তখন সোহরাব আর বাবুল তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এরা এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে, তার খোঁজ-খবর নিয়েছে।

মতিন খুব বেশি খেতে পারে না। সামান্য কিছুটা ভাত খাওয়ার পরেই তার ক্লান্তি লাগে। সে মাকে বলে, পরে খাবো। তার মা, বন্ধুদের সামনে লম্বা ঘোমটা টেনে দিয়েছেন তিনি, আরো কয়েক চামচ তাকে প্রায় জোর করেই খাওয়ান। মতিনের হাতে একটা লেবু পাতা, সেটা শুঁকে শুঁকে সে বিবমিষা দমন করে। মা তাকে আলাদা গেলাসে জল খাওয়ান। তারপর স্থানীয় এলএমএফ চিকিৎসকের দেয়া মিকচারের একদাগ ছোট্ট গেলাসে ঢালেন। ওষুধটুকু খেয়েই মতিন দু'বার ওয়াক তোলে, তবে বমি হয় না। মা নিজ হাতে তার মুখ মুছিয়ে দেন। তারপর আবার বালিশ সমান করে শুইয়ে দেন তাকে। তার গায়ের ওপর কাঁথাটাও টেনে দেন।

মা বিদায় নিলে বন্ধুরা তার চৌকির ওপর গিয়ে বসে। ২১ দিনের দাড়ি মতিনের গালে। তাকে খুব অন্যরকম দেখায়।

মতিন বলে, সোহরাব বস। খুব দুবলা হয়া গেছি রে।

তুই চুপ কর। রেস্ট নে। সোহরাব বলে।

ভাত খাওয়ার পর ব্রেনের রক্ত স্টোমাকে যায়। বাবুল বলে, ঘুম পায় তখন, খুব ঘুম পায়। তুই না হয় ঘুমা।

ঘুম। বহুত ঘুমাইছি। এবার অ্যাকশন। বাবুল, সোহরাব, কায়সুল ছার তার বাসাত উঠছে!

নারে। ওস্তাদ শামসুর লোকরা তো ওইটা একেবারে পাকাপাকি দখল নিয়া ফেলছে। সোহরাব বলে।

কলেজে এতোগুলান ছাত্র, ১২০ জনতো হইবেই, সবায় মিলি লাগলে ওস্তাদ পারে কী কর‍্যা! মতিন বলে।

বাবুল বলে, তুই সে রাতে আমাদেরতো খবর দিলি। এরপর আমরা পরদিন সব ছাত্রদেক খবর দেই। কলেজে মিটিং ডাকি। তখন কালাম ভাই আসে।

কোন কালাম ? মতিন বলে।

ভিপি কালাম! সোহরাবের জবাব।

কালাম ভাই কী বললো ? মতিন জানতে চায়।

কালাম ভাই আমাদের আলাদা করে ডাকলো। বললো, জলে বাস কর‍্যা কুমিরের সাথে লড়াই করবা কেমন কর‍্যা। ওস্তাদের কথায় সারা শঠিবাড়ি তো শঠিবাড়ি সারা মিঠাপুকুর রংপুর চলে। দু'চারটা খুন করা তো তার জন্য ব্যাপার না। বর্ডারে চোরাচালান করবার গিয়া রোজই তো লাশ-টাশ পড়ে। তার ওপর এখন আবার সরকারি পার্টিত জয়েন করছে। মারামারি কর‍্যা পারবা ? কলেজ তুল্যা দিবে। কলেজের ম্যানেজিং কমিটিত এ বছর কতো ট্যাকা চান্দা দিছে জানো। ১০ হাজার। সোহরাব বলে।

বাবুল বলে, 'ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছারও আমাদের ডাকছেন। আমরা গেছি। বলেন, অন্যায় হয়েছে, কায়সুল সাহেব মামলা করছেন, আমরা তাকে মামলার ব্যাপারে সাহায্য-

সহযোগিতা করতেছি। কিন্তু বাবা মারামারিতে তোমরা যেয়ো না। জমিজমার ক্যাচালের মধ্যে তোমরা ক্যান যাবা। স্যারের কাছে টিউশনি পড়ি। তার কথাতো শোনা লাগবে।

ও। তাইলে তোরা কিছুই করিস নাই। মতিন রাগী গলায় বলে।

নারে। ওঠ। তুই খাড়ায়া দাঁড়া। সবাই মিলাই একটা কিছু করা লাগবে। সোহরাব বলে।

বাবুল তখন প্রসঙ্গ পাল্টায়। তোকে বলে মতিন পরী ধরছে। তোর পরীটা তোকে মোহর দিয়া যায় নাই ?

সোহরাব বলে, পরীরা নাকি দেখতে খুব সুন্দরী হয়। আচ্ছা দোস্ত, পরীরা তো মানুষ না। তাইলে পরীরা তো কাপড়-চোপড়ও পরে না। দোস্ত, পরীটা কি তোর কাছে ন্যাংটা আসে ?

তোরা যা সোহরাব, আমার খুব খারাপ লাগতেছে। মতিন বলে। তারপর মন খারাপ করে সারা গা-মাথা কাঁথামুড়ি দেয়।

দুপুর একটু গড়িয়ে এলে মতিন তার নীল জামাটা গায়ে চাপিয়ে প্যান্টে পা গলিয়ে ঘর থেকে বের হয়। ইতিমধ্যে বর্ষার পানি নেমে গেছে। কিন্তু পথ-ঘাট বড়ো পিচ্ছিল আর কাদাময়। ভাঙা কালভার্টটা পেরোতে আর সাঁকো লাগে না।

সাঁকো নেই। সেই সাঁকোটা। যাতে তুমি আর আমি উঠেছিলাম। মতিন বিড়বিড় করে। বটতলা পর্যন্ত যেতেই সে হাঁপিয়ে ওঠে, কেননা আকাশে শরতের রোদ আর সে সদ্য উঠেছে রোগশয্যা থেকে। বটগাছের পাতাগুলো বর্ষার জলে ধুয়ে দারুণ চিকচিক করছে, আর বটের ফলগুলোও কতো লাল। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মতিন একটা রিকশা পায়, আর সোজা রওনা দেয় শাহিনদের বাসার উদ্দেশে।

সে ঠিক জানেওনা যে, কায়সুল স্যাররা এখন কোথায় থাকে, শাহিনদের বাড়িতে না অন্য কোথাও। তার সবচেয়ে অসহায় লাগে, যখন মনে প্রশ্ন জাগে, সাবিনাই বা কোথায়! সে কী করছে এখন! সে কি তার ওপর রাগ করেছে ? করাটাই তো স্বাভাবিক। কায়সুল স্যারের বাসা উদ্ধারের ব্যাপারে সে তাদের সহযোগিতা চেয়েছিল, তারপর থেকেই তো মতিনের আর খোঁজ ছিল না। সেই ক্ষোভেই নিশ্চয় সে আর তার (মতিনের) খোঁজ নিতে আসেনি। আহারে, মেয়েটা না জানি কেমন আছে। সেদিন রাতে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফেরার পর তার কপালে না জানি কী জুটেছে। মতিনের তো জ্বরেই গেলো একুশ দিন, মেয়েটার না জানি কেমন গেলো!

আজ এতোদিন পরে তাকে দেখে কী বলবে সাবিনা ? সে কি তার ওপর খুব রাগ করবে? নাকি তাকে দেখলেই ছুটে আসবে! বলবে, এতোদিন কই আছলেন! বলবে, সাইকেল আনেন নাই, তাইলে চলেন এক রিকশাত দুইজন ঘুর‍্যা বেড়াই।

শাহিনদের বাসার সামনে এসে রিকশা দাঁড় করায় মতিন। আপনে একটু খাড়ান, আমি আসতেছি— বলে সে বাসার ভেতরে ঢোকে। শাহিনের মার সঙ্গে দেখা হলে সে বলে, চাচি, কায়সুল ছার কই থাকে ?

ক্যান, ওরা ঘরত নাই ? ওই দিকে তো দরজা আছে। চাচিআম্মার কথায় সে এপাশের

দরজায় আসে। দরজায় নক করে। দরজা খোলে কায়সুল। কে ? কায়সুল জিজ্ঞেস করে। সে মতিনকে চিনতে পারে না।

স্যার, আমি মতিন স্যার। মতিন উদ্দীন।

ও ও। আসো আসো। ঘরে আসো। তোমার একি হাল হয়েছে মতিন। দাড়ি রেখে দিয়েছো। শরীর শুকিয়ে কাঠ।

অসুখত পড়ছিলাম স্যার। কঠিন অসুখ।

ও তাই বলো। অবশ্য শুনেওছি বটে। কিন্তু দেখতে যেতে পারিনি। আমার কী অবস্থা, তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

হ স্যার। আমি স্যার ওই বদমাশদের গুলি করে মারবো স্যার।

গুলি করে মারবে। গুলি কোথায় পাবে ?

পাওয়া যাবে স্যার। নিশ্চয় যাবে।

কথা বলতে বলতেই তারা ঘরের ভেতরে যায়। রেজিনা ঘুমুচ্ছিল, সে উঠে বিছানাতেই বসে।

মতিন একথা-ওকথা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু সাবিনার কথা কিছুই বলতে পারে না। বলা হয়ে ওঠে না। সে অন্য কথা বলে, ছার, থানা-পুলিশ করছেন ? মামলা ?

কায়সুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, হ্যাঁ। থানায় ডায়রি করেছি। ভাগ্য ভালো, থানার দারোগা আমাদের আত্মীয় মতন হয়।

আত্মীয় হয়। কেমন স্যার ? প্রশ্ন করে সে ভেতরের দরজার দিকে তাকায়, যদি সাবিনাকে দেখা যায়।

ওনার বাবা নাকি আমাদের বাড়িতে লজিং থাকতো।

ও। তাইলে তো স্যার সুবিধাই হইল।

সুবিধা। কিন্তু আইনের মানুষ। আইনের বাইরে তো যেতে পারে না। এখন আদালত যদি বলে, যাও, বাড়ি থেকে ইলিগ্যাল পজেশন তুলে দাও, তারা দেবে। মুশকিল হলো, এই বেটা ওস্তাদ তো ফল্‌স দলিল সাবমিট করেছে। পুলিশ তো বলতে পারে না, কোনটা আসল, কোনটা নকল।

তাইলে স্যার মামলার কী অবস্থা ?

মামলার অবস্থা তো ভালোই। একজন খুব ভালো উকিল পেয়েছি। রংপুরের এক নম্বর উকিল। নাম শুনেছো নাকি, এডভোকেট আজিজার রহমান।

জে। শুনছি স্যার।

পিটিশন তৈরি হয়েছে। ফাইল করা হয়ে গেছে। আর বলো না। ঝামেলার কী শেষ আছে। সেরেস্তাদারের ইচ্ছা। উনি তার ইচ্ছামতো ফাইল করছেন। এখনও তো মামলার ডেটই পড়েনি। বখশিশ-টখশিশ দিতে হয়। এখন তুমি ছাত্র পড়াবে, সংসার করবে, নাকি মামলা চালাবে।

রেজিনা ইতিমধ্যে একটা পিরিচে কতোগুলো আজাদ সুপার বিস্কুট নিয়ে এসেছে।

নাও, বিস্কুট খাও। কায়সুল বলে।

রেজিনা বলে, চা খিলাতে পারলাম না। অন্যের চুলা, অন্যের ঘর। অসময়ে চা বানাতে পারি না ভাই।

না। চা খাই না তো। অভ্যাস নাই। মতিন বলে। বিস্কুটে একটা কামড় দিয়ে তার অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে। মনে হয় কৌটোর মধ্যে তেলাপোকা ঢুকেছিল। অথবা জ্বরে তার জিভ বিস্বাদ হয়ে গেছে। অর্ধেকটা বিস্কুট সে কী করবে বুঝতে পারে না।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে সে বলে, সাবিনা আপা কোটে। তাকে যে দেখি না। তার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখেও রক্তিমাভা দেখা যায়।

কায়সুল বলে, ও তো চলে গেছে বাড়িতে। সে তো ঘটনার পরদিনই। একটা ঘর। আমরা কোথায় থাকি। সাবিনা কোথায় থাকে ? বয়স্ক মেয়ে।

স্যারের শ্বশুর-বাড়িটা জানি কোথায় ?

তখন রেজিনা মুখ খোলে। তার বাবার বাড়ির ঠিকানা বলে। খুব খ্যাতিমান ফ্যামিলি, বাসস্ট্যান্ডে নেমে কিংবা বাজারে নেমে যে কাউকে বললেই যে বাড়ি দেখিয়ে দেবে, সেই সব সে সবিস্তার বলে।

মতিন মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, সে যাবে সাবিনার বাড়ি। কিন্তু গিয়ে কী বলবে সে সাবিনাকে। সাবিনা তার কাছে একটা জিনিস চেয়েছিল। কায়সুল স্যারের বেদখল বাড়িটা পুনরুদ্ধার। কিন্তু এ ব্যাপারে তো সে কিছুই করতে পারেনি। কেন যে অসময়ে বেধে বসলো অসুখটা। এখন যদি ছায়াকুঞ্জের ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি সাধন না করেই মতিন গিয়ে হাজির হয় কায়সুল স্যারের শ্বশুর বাড়ি, হাজির হয় সাবিনার সামনে, সাবিনাকে সে মুখ দেখাবে কী করে। সাবিনা যখন তাকে বলবে, তোমার কাছে আমি বেশি কিছু চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম একটা অন্যায়ের প্রতিকার, তুমি একটা যুবক ছেলে, তা কি করতে পেরেছো। চেষ্টা করেছো ? কী জবাব দেবে মতিন। না, মতিন চেষ্টা করবে। এই কালোবাজারি চোরাচালানিদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করতেই হবে।

মতিন বলে, ছার চিন্তা করবেন না স্যার। আমি যখন উঠ্যা খাড়াইছি, আর কোনো চিন্তা নাই। যেমন কর‍্যাই হোক, বাড়ি আমি দখল নেবোই। নেবোই নেবো।

কায়সুল আর রেজিনা মতিনের এ প্রতিজ্ঞায় বুকে বড়ো বল অনুভব করে। কায়সুল বলে, ভাই তুমি যে একথা বলেছো, এতেই আমি অনেক খুশি। এতেই তো সাহস পাই। আইনের আশ্রয় নিয়েছি। নিশ্চয় সত্যের জয় হবেই। তার পাশাপাশি যদি তোমরা একটু খোঁজ-খবর নাও, সত্যি সাহসটা বেড়ে যায় বহুগুণ। কায়সুল কথা বলতে বলতে মতিনের হাত ধরে তাকে প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

মতিনের ব্যাপারটা ভালোই লাগে। নিজেকে তার যথেষ্ট শক্তিমান মনে হয়।

কায়সুল। বেচারা কায়সুল। ডুবন্ত ব্যক্তি খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে। আর ছাত্রশক্তির মতো আশ্রয় পেলে কেই বা তা আঁকড়ে ধরতে চাইবে না।

মতিনের খুব সাবিনার মুখ মনে পড়ে। সে কেঁদে ফেলে। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে ফেলে, আপা, সাবিনা কি যাওয়ার আগে আমার কথা কিছু বলে গেছে ?

না তো।

কিছু বলে নাই।

না।

ও আচ্ছা!

মেয়েটা তো বাড়ি যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলো। আমরা বললাম, আরো দু'একদিন থাক। তারপর যা। সে কিছুতেই থাকবে না। একরকম জোর করেই চলে গেলো। রেজিনা বলে!

ও! খুব মন খারাপ করে বিদায় নেয় মতিন। কেন তাকে এতো হতোদ্যম দেখাচ্ছে— কায়সুল-রেজিনার মনে সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন জাগে না।

তবে রেজিনা যতো নিরীহ স্বরে বললো যে, সাবিনাই থাকতে চায়নি, সেই জোর করে চলে গেছে পিতৃগৃহে, ব্যাপারটা এতো সরল নয়। সে রাতে বৃষ্টির মধ্যেও যখন সাবিনা ফিরছিল না, তখনই একাগৃহে রেজিনার ঘোরতর সন্দেহ হয়। সন্দেহের একটা কারণ হলো— কায়সুল ঘরে নাই। আর ডাক্তারখানার মোটা মহিলা তাকে বলে রেখেছে, স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্বামীর মতিগতি ঠিক থাকে না, এই অবস্থায় শ্যালিকারা বিশেষভাবে বিপজ্জনক। একা ঘরে, যে ঘর অন্যের, বাইরে তুমুল বৃষ্টি, রেজিনার মনে নানা রকমের ভাবনাই উঁকি দেয়। এরমধ্যে সে দেখতে পায়, প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কায়সুল আর সাবিনা হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। তারা আর কিছুই করছে না, শুধুই হাঁটছে। এরপর যখন বেশ রাত হয় এবং রেজিনা ফেরে না, তার সন্দেহ গাঢ় হয়। রেজিনা যখন ঘরে ফেরে, তখন সে বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে। তার পরনে ছিল হালকা ঘিয়া জামা, বৃষ্টিতে ভিজে তা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। ঘরে বিদ্যুৎ বাতি ছিল, তার আলোয় রেজিনা দেখতে পায় সাবিনার শরীর প্রকট হয়েছে, বিবাহিত ও অভিজ্ঞ রেজিনা জানে, পুরুষের স্পর্শই কেবল নারীর শরীরকে এভাবে উত্তুঙ্গ করে তুলতে পারে। তার সন্দেহের আগুনে ঘি পড়ে। এর মিনিট পনেরো পরেই বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে কায়সুল ঘরে ফিরলে দুইয়ে দুইয়ে চার হয়ে যায়। রাতে তারা একই ঘরে শুতে বাধ্য হয়। রেজিনার চোখে সারারাত সামান্য ঘুমও আসেনি। মধ্যরাতে সে কায়সুলকে ধীরে ধীরে ডেকে তোলে। কায়সুলেরও চোখে ঘুম ছিল না। তার মনে হচ্ছে, ঠিক যেন তার শরীরের একটা অংশ সে পুঁতে রেখে এসে ছায়াকুঞ্জে। সামান্য ডাকেই তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন তাকে রেজিনা জিজ্ঞেস করে, তুমি আর সাবি কোথায় গেছলা ?

সাবি? সাবি বাইরে গিয়েছিল নাকি ?

ঢং করো না। কোথায় গেছলা, খালি সেটা বলো।

রাতের বেলা এসব তুমি কী বলছো ?

ও! আমি বুঝি কিছুই বুঝি না। একজন বার হয়া গেল। একটু পর আরেকজন বারালো।

একজন বৃষ্টিতে ভিজ্যা জবজবা হয়া ঢুকলো। খানিক পর আরেকজন আসলো। আমি কিছু বুঝি না। আমি বুঝি চাল সিদ্ধ কর্যা ভাত খাই না।

চুপ করো তো। ছোটো মনের মেয়েলোক কোথাকার ?

ও আমি ছোটোলোক। আর তোমরা কী। এখন রাস্তাত রাস্তাত ঘোরা হচ্ছে। এই মেয়ে আমার সোনার সংসারত আগুন লাগাছে। ওর জন্য আজ আমরা বাড়ি ছাড়া হলাম। আবার ওর জন্য তুমি আমাক গালিগালাজ করছো। কালকাই ওকে বাসত তুল্যা দিবা। কালকাই!

তখন হঠাৎ সাবিনার গলা শোনা যায়। সাবিনা বলে বুবু, আমাক তুল্যা দেওয়া লাগবার নয়। আমি নিজ থাকাই চল্যা যাবো। ছি বুবু, তোমার প্যাটত এতো কুচিন্তা। ছি।

পরদিন খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সাবিনা এই ঘর ছাড়ে। কায়সুল খুবই সমস্যায় পড়ে। তাকে বাসে তুলে দিতে যেতেও তার আর সাহস হয় না।

আজ কায়সুলের মামলার প্রথম তারিখ। ভেতরে ভেতরে কায়সুল খুবই উত্তেজিত। মামলা ব্যাপারটার মধ্যে সে এর আগে কোনোদিন যায়নি। সে তো নির্বিবাদী হিসেবেই পরিচিত ছিল। খানিক খ্যাতি ছিল জীবনানন্দ দাশের ভক্ত বলে। রাজশাহী থেকে পড়াশুনা শেষ করে সে শঠিবাড়িতে এসেছে শিক্ষকতা করতে, তার মধ্যেও একটা জীবনানন্দ জীবনানন্দ গন্ধ সে আবিষ্কার করতে পারে। নিজের ভেতরে নিজেই তখন কেমন রোমাঞ্চ হয়। জমি-জমার মতো স্থূল বিষয় নিয়ে তাকে আজ কোর্টে দাঁড়াতে হবে। হয়তো দাঁড়াতো না, যদি না, ব্যাপারটার সঙ্গে ন্যায়-অন্যায়ের নীতিগত দ্বন্দ্বের প্রশ্ন জড়িয়ে যেতো। অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। অন্যায় সহ্য করাও অন্যায় করারই সমান।

যাক। আজ তার মামলার ডেট। সকাল ৭টায় গরম ভাত রেঁধে দ্যায় তাকে রেজিনা। এখনো তারা আছে ছাত্র শাহিনেরই বাসায়। শাহিনের মাকে কায়সুল অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, বাসা ভাড়া হিসেবে সে তাকে সামনের মাস থেকেই কিছু টাকা দেবে, তিনি যেনো আপত্তি না করেন।

না, বাবা, যদ্দিন দরকার থাকেন। কয় টাকাই বা ভাড়া হইবে, কী বা নেবো ?

না খালাম্মা। ও কথা বললে শুনবো না। আর যদি ভাড়া না নেন, বুঝবো, আপনারা চান না আমরা থাকি। তাহলে আমি বাসা খুঁজি। একটা ঘর হলেই তো আমার চলে যায়।

না না। অন্য বাসা কই খুঁজবেন। থাকেন। শাহিনের মা বলেছেন।

এখন গরম ভাত গপ গপ করে খেতে গিয়ে মুখের তালুতে গিয়ে আটকেছে ভাত। এক গ্লাস পানি ঢোক ঢোক করে খেয়ে নিতে হয় তাই কায়সুলকে।

রেজিনা বলে, তরকারি তো বেশি কিছু রাঁধতে পারলাম না। কালকা রাতের বাসী তরকারি গরম করা দিলাম। অন্যের পাকঘর। ওদেরও তো চুলা লাগে। তাই তরকারি রানতে পারি নাই।

না না। তরকারি লাগবে কেন ? ভালোই তো লাগছে। তখন রেজিনা একটু তরকারিতে মুখ দেয়। মাছের তরকারি। একটা চামচের ডগায় সুরুয়া তুলে সে টান দেয়। সুরুৎ করে সুরুয়া তার মুখে ঢোকে। অ্যা, ছি। তরকারি তো গন্ধ হয়া গেছে। তুমি খাচ্ছো কেমন কর্যা ?

রাখো। রাখো। ছি বলো না। অস্থির হয়োনা। বেশ খেতে লাগছে। আর ক'টা দিন। আজকে যখন জজ সাহেব আমার কাগজপত্র দেখবেন, আরে খাজনা দিয়েছি। দাখিলা পর্যন্ত আছে, উনি কি পানির মতো পরিষ্কার বুঝতে পারবেন না। আমার তো মনে হয়, আজকেই জজ সাহেব বলে দেবেন, নিরীহ কলেজ শিক্ষককে হয়রানি করার কোনো মানে হয় না। হয়তো এমন হবে বদমায়েশগুলোকে উচ্ছেদ করার জন্যে থানাকে নোটিশ দিয়ে দেবেন। আমাদেরকে আমাদের বাড়িতে পুলিশ তুলে দেবে!

আল্লাহ যেন তাই করে। আমি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বো। তাহলেই তো সব ঝামেলা মিটা যাবে, না গো!

আরে না। তুমি তো সরল। ভাবছোও সরল। তারপরেও মামলা চলতে থাকবে, দেওয়ানি মামলা। সহজ নয়। নানা ফ্যাকরা। তবে আমাদের নিশ্চয় বাড়িতে তুলেই দিবে। বাড়ি বানিয়েছি, সিমেন্ট কিনেছি, সব কাগজপত্রই তো আমার কাছে আছে। মুন্সেফ সাহেব নিশ্চয় বিচক্ষণ ব্যক্তি।

সাড়ে সাতটার মধ্যে শঠিবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে হাজির কায়সুল। যাওয়ার পথে বাঁয়ে কলেজটা পড়ে, সেদিকেও একবার তাকায়, সকালবেলাকার কলেজ আর দুপুর বেলাকার কলেজের মধ্যে কতো পার্থক্য। এখন মনে হচ্ছে মাঠে একটা বিসদৃশ সাদা বিল্ডিং, একতলা, অকারণে লম্বা, বেঢপ। আর দেওয়ালে কতো লেখা, কতো পোস্টার। মাঠের মধ্যে এই সকাল বেলাতেই গরু চরছে, ছাগল চরছে। বারান্দাতেও বসে আছে দুটো ছাগলছানা।

অবশ্য এই ছাগলছানা দুটো সত্যই সুন্দর। রোদ পড়ে তাদের গা কেমন চিকচিক করছে। তবে ক্লাস রুমগুলোর ভেতরে যারা ঢোকার অধিকার পায়, তাদের মধ্যে যারা থাকে ছাগল প্রজাতির, তারা দেখতে এতো সুন্দর নয়। সবচেয়ে ভয়াবহ ছাগল কিন্তু যারা লেকচার শোনে, তারা নয়, যারা দেয়, তাদের মধ্যেই আছে। পড়াতে জানে না, নকল করে পাস করেছে, বিদ্যাবুদ্ধি তো নেই-ই নেই, কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নেই। পরীক্ষার হলে গার্ড থাকে, ছাত্রদের নকল করতে সাহায্য করে।

এখন আইএ পরীক্ষা চলছে। তাদের কলেজে অবশ্য সেন্টার পড়েনি, সেন্টার পড়েছে মিঠাপুকুর কলেজে। তবে পরিদর্শক হিসেবে তাদের কলেজের শিক্ষকরাও নিয়োজিত। এই কাজটা সবার পছন্দের, কারণ তাতে কিছু বাড়তি টাকা আসে। সবচেয়ে বড়ো অংকের টাকাটা অবশ্য আসে পরীক্ষার্থীদের দেয়া চাঁদা থেকে।

দেশটার যে কী হবে ?

পরীক্ষা কেন্দ্রে আজ অবশ্য কায়সুলেরও ডিউটি ছিল। কায়সুল যায়নি। ভাগ্যি প্রিন্সিপ্যাল স্যার লোক ভালো, না হলে ঝামেলা হতে পারতো। উপস্থিত না হওয়ার কারণ হিসেবে মেডিক্যাল লিভ নিতে হয়েছে। এটা অবশ্য কায়সুলের তেমন পছন্দ হয়নি। সে তো সিক নয়, তাহলে কেন সে সিক লিভ নিতে যাবে। কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। আমি আদালতে যাচ্ছি মামলা করতে, আমিই বাদ— এটা দরখাস্তের ভাষা হতে পারে না।

ব্রিটিশরা যে দরখাস্তের কী এক ভাষা প্রবর্তন করে গেছে। অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, আমি যে ব্যাটা অধীন, স্বাধীন নই, এই কথাটা দিয়েই শুরু করতে হবে। আই বেগ মোস্ট রেসপেক্টফুলি— আরে হারামজাদা, আমি ভিক্ষা করতে যাবো কেন, আমি কি ফকির নাকি! ছুটি কি তুই তোর বাপের গোডাউন থেকে দিবি? প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সঙ্গে অবশ্য এসব বিষয় নিয়ে তর্ক করেনি কায়সুল। বেচারা। এসব কথা বুঝবেই না!

শঠিবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে কায়সুল দাঁড়িয়ে আছে দশ মিনিট। সকালবেলাকার রোদটা গায়ে মিষ্টিই লাগছে। কিন্তু চোখে এসে বিঁধছে। একটা সানগ্লাস থাকলে ভালো হতো। রোদচশমা! রোদচশমা শব্দটা খুবই সুন্দর।

দশ মিনিট হয়ে গেলো, কিন্তু একটাও বাস আসছে না, না রংপুরের দিক থেকে, না বগুড়ার দিক থেকে। ব্যাপার কী! সে রাস্তার পাশের পান-বিড়ির দোকানে যায়— কী ব্যাপার ভাই, বাস আসে না কেন ?

গণ্ডগোল হইছে শুনলাম। পীরগঞ্জত নাকি বাসআলার সাথে মারামারি হইছে ট্রাকআলাদের। এইজন্যে বাসও বন্ধ। ট্রাকও বন্ধ।

বলেন কী! এদের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই ? আইএ পরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে স্ট্রাইক। ছেলেগুলো পরীক্ষার হলে যাবে কী করে।

কায়সুল একথা বলে বটে, কিন্তু পরীক্ষার্থীদের জন্য নয়, সে উদ্বেগবোধ করে নিজের জন্যে। সে কি তাহলে আদালতে হাজির হতে পারবে না ? এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সে গরহাজির থাকবে। তা হতেই পারে না। যেভাবে হোক যাবেই।

আপনে কোটে যাবেন ছার ? পানঅলা জিজ্ঞেস করে।

রংপুর।

আজকা আর যাওয়া হবার নয়। কাইল যাইবেন।

না না। আমাকে আজই যেতে হবে।

মুশকিল কী ছার, যদি বাসের এস্ট্রাইক হইল হয়, তাইলে আপনে টেরাক পাইতেন। কিন্তু এখন বাসও পাওয়া মুশকিল, টেরাকও পাওয়া মুশকিল। দুই দলের মারামারি।

মারামারিটা লাগালো কে ? ওস্তাদের লোকেরা লাগায়নি তো ? ওস্তাদ শামসু...?

না ছার। পীরগঞ্জের মারামারিতে ওস্তাদের হাত নাই।

সন্দেহটা কায়সুলের মনে গভীরভাবে গেঁথে যায়। ওস্তাদ শামসু সব পারে। রাস্তা বন্ধও করে দিতে পারে। ও নিশ্চয় জানে, আজ কায়সুলের মামলা আদালতে উঠছে! জেনে শুনেই সে তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। যে করেই হোক এই বাধা তাকে অতিক্রম করতে হবে। কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

তাইলে কী করা যায় ? পানঅলাকেই প্রশ্নটা ছোড়ে কায়সুল।

এক কাজ করেন। মিঠাপুকুর চলি যান। বিআরটিসি বাস যদি আসে, তাইলে তো মিঠাপুকুর ছাড়া থামবার নয়।

গুড। গুড সাজেশন।

একটা শেয়ারের রিকশা মিঠাপুকুর মিঠাপুকুর বলে চেঁচাচ্ছে। তাতে একজন প্রৌঢ় লোক বসা। কায়সুল দৌড়ে গিয়ে সেই রিকশায় উঠে বসে।

মিঠাপুকুর পর্যন্ত যেতে বেশি সময় লাগে না। আকাশ ভালো, চমৎকার বাতাস, ফাঁকা রাস্তা— সব মিলিয়ে ব্যাপারটা উপভোগ্যই ছিল। কিন্তু সেদিকে তাকানোর মতো মনের অবস্থা কায়সুলের নয়। নয়টা বেজে গেলো শুধু মিঠাপুকুর পর্যন্ত পৌঁছাতেই।

মিঠাপুকুরে নেমে কায়সুলের নিজেকে বোকা বোকা লাগে। এখন সে কী করবে ? যাবে নাকি থানায়, ওসি সাহেবের কাছে। তিনি কি কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না ?

একবার চায়ের দোকান, একবার বাসস্ট্যান্ডে ভিড় করা যাত্রী সাধারণের কাছে যায় কায়সুল। কে কী বলছে, শোনার আর বোঝার চেষ্টা করে। বিভিন্ন জনের টুকরা-টুকরা মন্তব্য থেকে সে স্থির নিশ্চিত হয় যে, বাস আজ আর চলবে না। তাহলে কি আজ আর যাবে না রংপুর। না। তা হতে পারে না। তাকে যেতেই হবে রংপুর। কাচারি বাজার।

সত্যের জয় হবেই। তবে সত্যের জয় সহজ নয়। পথে নানা বাধা-বিপত্তি আসেই। কায়সুল বিড়বিড় করে। কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ, উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ। সে ঠিক করে যে, রিকশায় যাবে। কতো মাইলের পথ আর। ১৫ মাইল, ১৮ মাইল।

যাবে নাকি ভাই রংপুর। রিকশার জটলা পেয়ে সে বলে অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে। যে যেতে চায় আর কী! সম্মুখবর্তী রিকশঅলাটি হাসে, না বাহে, যামো না। পশ্চাদবর্তী দু'জন রিকশাঅলা প্রস্তাবটি লুফে নেয়, যামো বাহে যামো।

একজনকে তার বাছাই করতেই হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সচরাচর কায়সুল মুশকিলে পড়ে। কাকে সে অগ্রাধিকার দেবে! র‍্যান্ডম স্যাম্পলিংই করতে হয়। 'কতো নেবেন? কাচারি বাজার পর্যন্ত ?

চলেন। ৫০ টাকা দিয়েন।

রংপুর চেনো ?

চিনবো না ক্যানে ? অংপুরেরই একশা। দেখেন। পাছাত লাইসেন্স নম্বর আছে। পৌরসভার চেয়ারম্যানের।

ও। রংপুর পৌরসভায় প্রতি মাইল কতো টাকা ভাড়া ?

তার কি ঠিক আছে বাহে। যার কাছে যতো পাওয়া যায়।

ও। কাচারি বাজার থাকি বগুড়া বাসস্ট্যান্ড কতো নাও।

তিন টাকা।

তাহলে তো মাইলে নাও এক টাকা। এখান থেকে ভাড়া হয় ১৫ টাকা।

বাস বন্ধ। অন্য কোনো উপায় নাই। এক্শাই ভরসা। তাইলে ভাড়া তো বেশি দেওয়াই লাগে।

ও। ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই। ডিমান্ড এন্ড প্রাইস। কায়সুল ভাবে।

দ্বিতীয় রিকশাঅলা বলে, আপনে একলাই যাইবেন!

হ্যাঁ।

ওঠেন।

কতো নিবে।

দিয়েন ইনসাফ করি।

ইনসাফ করা যাবে না। কতো নেবে বলো।

ঠিক এক কুড়ি দশ টাকা নেমো। যাইবেন।

যাবো। কায়সুল উঠে বসে।

রিকশায় যেতে কতোক্ষণ লাগবে কে জানে। ইতিমধ্যে ১০টা বেজে গেছে। এতো দীর্ঘপথ, রিকশাঅলাকে বলতেও পারছে না যে জোরে চালান।

রিকশায় উঠেছে মিনিট দশেক হলো। মাইল দেড়েক পথ তারা এগিয়েছে রংপুরের দিকে। তখন হঠাৎই, রংপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। কী ব্যাপার। বাস কি চলতে শুরু করলো নাকি। সত্যি তাই। এরপর উভয় দিকে বাস-ট্রাক-কার নানা কিছু চলতে শুরু করে। কায়সুল এখন কী করবে! ইস্, আর পাঁচটা মিনিট যদি সে অপেক্ষা করতে পারতো।

রিকশাঅলা ভাই, পরের বাসস্টপেজে আমাকে নামিয়ে দাও ভাই। আমার মামলা আছে। ১০টায় কোর্ট বসে। এখন বাজে সোয়া দশটা। রিকশায় গেলে তো দুটো বাজবে। আমি ভাই বাসেই যাবো।

বাসে যাবার চান। যাইতে পারেন। আপনার ইনসাফের উপরে। কিন্তু আপনের সাতে মোর চুক্তি হইচে কাচারি বাজার যাওয়ার।

তা ঠিক। কিন্তু...।

আপনে না গেলেও তো মোক অংপুর যাওয়াই লাগবে। মোর তো অংপুরের একশা।

তা ঠিক। আমি তোমাকে ১০ টাকা দিই। বাকি ২০ টাকা তুমি ভাই অন্য খ্যাপ থেকে পুষিয়ে নাও।

এইটা কি ইনসাফের কথা হইল। আজকা আপনের মামলা। গরিব মানুষক ঠকাইবেন।

তুমি এটা কি কথা বললে! ছ্ছু। আচ্ছা নাও। ১৫ টাকাই দেবো। ওই যে সামনের মাজারটাতে থামিও।

রিকশাঅলা কথা শোনে। তাকে মাজারের সামনে নামিয়ে দেয়। মাজারেও এক টাকা দান করে কায়সুল। এটাও সম্ভবত তার জীবনে প্রথম। মাজারের টাকাগুলো কোথায় যায়, এটা তার একটা মৌলিক জিজ্ঞাসা।

বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে সাড়ে এগারোটায় রংপুরের কাচারি বাজার এলাকায় পৌঁছায় কায়সুল। এখানে আজিজার উকিলের একটা চেম্বার আছে। সেখানেই আগে খোঁজ করা দরকার। সেই খোঁজ নিতে গিয়ে সে পড়ে এক টাউটের পাল্লায়।

কাচারি বাজার রংপুরের আদালতপাড়া। ডিসি অফিসের পাশে মহকুমা অফিস, তার কাছেই বড়ো রাস্তার এ পাশ-ও পাশ জুড়ে ছড়ানো-ছিটানো আদালতের লাল সুড়কির ভবন। এক পাশে প্রবাহিত শ্যামাসুন্দরী খাল। শ্যামাসুন্দরীর এই পাড়েই একটা স্তম্ভ খাড়া রয়েছে, যাতে লেখা—

খরার আকরভূমি এই রঙ্গপুর
প্রণালী কাটিয়া তাহা করিবারে দূর
মাতা শ্যামসুন্দরীর নাম রাখিবার তরে
রাজা জানকীবল্লভ এই কীর্তি করে।

তার এদিকটায় বড়ো একটা চালার নিচে বসে আছে শত শত মুহরি, তারা সব ক্রমাগত দলিলের নকল লিখেই চলেছে। স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের চালা এদিকে ওদিকে, টাইপ মেশিন নিয়ে বসে আছে পথের দু'ধারে কয়েকজন, মধ্যখানে আছে বার লাইব্রেরি, আর এসব ঘিরে গড়ে ওঠা ভাতের হোটেল, থাকার সস্তা হোটেল, সিঙ্গারার দোকান, কাগজের দোকান, কনফেকশনারি— কতো কিছু। মানুষজনের আগমন লেগেই আছে— ছুটির দিন ছাড়া।

এই ভিড়ের মধ্যে এসে কায়সুল যখন একজনকে জিজ্ঞেস করে আজিজার উকিলের চেম্বার কোথায়, তখন লোকটা তাকে বলে— আজিজার উকিলের কাছে যাইমেন, বড়ো নামি উকিল, মামলা জিততে হলে চাই এডভোকেট আজিজার রহমানের মতো লোকই। আসেন, কায়সুল তার পেছনে পেছনে যেখানে যায়, সেটা একটা বাঁশের ছাপড়া, সেখানেও দুইজন কালো কোট পরা লোক বসে আছেন। আসেন বসেন, বলেন তো আপনার কী ঘটনা? তারা বলে।

আমি আজিজার রহমান এডভোকেটের কাছে এসেছি, বলে কায়সুল।

ও আজিজার ভাইয়ের কাছে। এই এনাকে এখানে এনেছো ক্যান ?

আজিজার রহমান না হসপিটাল ভর্তি হইছে। তার কেস গুলান না আপনাকে দেখি যাইতে

বলছে। লোকটা চোখ টেপে।

তখন কায়সুল সেখান থেকে উঠে পড়ে।

আজিজার রহমান উকিলের চেম্বার খুঁজে পেতে অবশ্য তার দেরি হয় না। সে সোজা বার লাইব্রেরিতে চলে যায়, সেখানেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় চেম্বারটার অবস্থান।

এডভোকেট আজিজার রহমান এন্ড এসোসিয়েটস। চেম্বারের গায়ে কালো সাইনবোর্ডে সাদা লেখা পড়ে এবার কায়সুল ভেতরে ঢোকে। সিনিয়র এডভোকেট সাহেব নাই। জুনিয়র সাহেব আছেন।

তার কাছ থেকেই জানা যায়, তিনটার সময় তাদের কেস উঠবে আদালতে।

যতো উৎসাহ নিয়ে কায়সুল গিয়েছিল রংপুরের দিকে, ঠিক ততোখানি হতাশা নিয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়। তিনটার সময় তার ডাক পড়বে, এই আশায় সে আদালতের বারান্দায় পাক পেরেছে অনেকক্ষণ। পিয়াসীর দোকানে জুনিয়র এডভোকেট সাহেব আর তার ক্লার্ককে নিয়ে বসে চা আর সিঙ্গারা খেয়ে কাটিয়েছে খানিক সময়। সামনের রাস্তার মোড়ে মোকসেদ আলী কবিরাজের সাপের খেলা দেখে কাটানোর চেষ্টা করেছে ঘণ্টা আধেক। তারপর মহা উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে সে ঢুকেছে এজলাসে।

পুরনো আমলের বিল্ডিং। ছাদের নিচে বড়ো বড়ো লোহার কড়িবর্গা। আদালতের লাল কাপড় দেয়া বিচারকের টেবিল। কাঠগড়াও আছে একটা। পেশকার হলেন যিনি পেশ করেন। সেরেস্তাদার হলেন নথিপত্র ঠিক রাখার মালিক। এছাড়া মনে হলো পিয়ন পর্যন্ত বেশ ক্ষমতার মালিক, কারণ তিনি সিল মারেন। তিনটা বাজার খানিকক্ষণ পরে জজ সাহেব আদালতে ঢোকেন। তার আগমনের আগে পরের আনুষ্ঠানিকতাগুলোও ঠিকভাবে পালিত হয়। তার পরের জিনিসটা আর চলচ্চিত্রের আদালতের পর্যায়ে থাকে না। এডভোকেট সাহেব, আপনার কী। পিটিশন। আচ্ছা। কবে তারিখ দেওয়া যায়। আগামী মাসের পঁচিশ। ঠিক আছে।

মুন্সেফ সাহেব ঘচঘচ করে কাগজে সই-টই করেন।

ব্যাস হয়ে গেলো— আজ এই পর্যন্তই। ব্যাপারটা কী হলো। নেক্সট পঁচিশ তারিখে বিবাদী পক্ষ অ্যাপিয়ার করবে। গোলাপ উকিল তাকে বোঝায়।

এই পর্যন্ত অগ্রগতি সাধন করে কায়সুল শঠিবাড়ির পথ ধরে।

ভগ্নমনোরথে এবং যথাক্রমে রিকশায় ও বাসে করে শঠিবাড়ির বর্তমান আশ্রয়টিতে ফেরে কায়সুল। তখন তাকে খুব হতাশ আর ক্লান্ত দেখায়। তার জামায় ইস্ত্রি নেই, প্যান্টের নিচে ধুলো, চুল উস্কোখুস্কো, চোখের নিচে কালি, সমস্ত শরীর জুড়ে অবসাদ।

ঘরে ঢুকে সে স্যান্ডেল না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। রেজিনা তার অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। ফলে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে না। চুপচাপ পাশে বসে থাকে।

তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ভোল্টেজ কম থাকায় বিদ্যুতের হলদে আলোয় ঘরটাকে আরো বিষণ্ন দেখায়। ঘরে কতোগুলো পোকা আলোটাকে ঘিরে উড়ছে।

মহিলার পক্ষে বেশিক্ষণ নীরব থাকাটা সত্যি কষ্টের। রেজিনা বলে, স্যান্ডেল পায়ে, ধুলা গায়ে শুয়া পড়লা ক্যান ? ওঠো। বারান্দাত ওজুর পানি দিছি। হাত-মুখ ধো। সারাদিন কিছু খাছো ?

কায়সুল কোনো কথা বলে না।

যেমন ছিল তেমনি করেই শুয়ে থাকে।

সারাদিন কিছু খাও নাই। ন্যাও কাপড়-চোপড় ছাড়্যা ভাত খাও।

আরে যন্ত্রণা! খালি খাওয়া খাওয়া করো কেন ? কায়সুল হঠাৎ উচ্চ স্বরে জবাব দেয়।

রেজিনা আহত হয়। তার কান্না পায়।

এ বাড়িতে কাঁদারও কোনো অবকাশ নেই। মানুষের জীবনে চাই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা। যতোই তুমি যৌথ মিলিত জীবন ভালোবাসো না কেন, তোমার চাই একটা নিজস্ব কোণ, যেখানে তুমি কিছুক্ষণের জন্যেও একা হতে পারবে। সম্পূর্ণ একা। আর কিছু না হোক, যেখানটায় তুমি কাউকে না দেখিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে পারবে।

কান্নার জন্যেও চাই নিজস্ব পরিসর, চাই নিজস্ব জানালা, চাই নিজস্ব আকাশ।

রেজিনা আজ এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে। এখন এই দুর্বোধ্য ক্লান্ত বিধ্বস্ত মানুষটির সামনে কান্না-কাটি করাটা শোভন নয়, আর বাইরে গিয়ে অন্যের সামনে চোখের ফেলাটা তো রীতিমতো অশোভন।

শাড়ির আঁচল টেনে সে কান্না গোপন করার চেষ্টা করে। লাভ হয় না। মুখ ফিরিয়ে কায়সুল দেখে ফেলে তাকে, দেখে যে, সে ফোঁপাচ্ছে। কায়সুল আরো বিরক্ত হয়।

'উফ। কান্না-কাটি করার কী হলো।'

কান্না-কাটি করার কী হলো, এ কথাটা এখন কায়সুলকে বোঝাবে কে ? তুমি সারাদিন রোদ মাথায় করে কোর্ট কাছারির বারান্দায় হয়রান হয়ে ঘোরাফেরা করেছো, আর আমি বুঝি কিছুই করিনি। সারাটা দিন একা ঘরে তোমার এই আগমনটার জন্যে অপেক্ষা করিনি। ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হইনি। আসার পর তোমার যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্যে প্রস্তুতি নিইনি।

আর এই কি তার জবাব!

রেজিনার বুক ভেঙে কান্না উথলে ওঠে। কান্নার গমকে তার শরীর কাঁপতে থাকে। তার

শৈশবে সে একদিন কিসের শোকে অভিমান করে বাড়ির পেছনের পুকুর পাড়ে বসে ছিল, তার হাতে ছিল এক লম্বা পাটখড়ি। সে সেই পাটখড়িটা তুলে তুলে পুকুরের জলে সপাং সপাং কোপ দিচ্ছিল, এই দৃশ্যটা তার মনে পড়ে— অকারণেই।

কায়সুলেরও কিছু ভালো লাগে না। এই সন্ধ্যাটাকে কেমন হতচ্ছাড়া বলে মনে হয়। সে শুয়েই থাকে। যদিও শুয়ে থাকতেও তার ভালো লাগছে না।

মতিনকে যে পরী ধরেছে, এতে আর সন্দেহ থাকে না। একদিন ভরদুপুর বেলা, দেখা যায়, একটা গাছের মগডালে মতিন ঝুলছে। দুইহাত গামছা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। সেই গামছাটা বাঁধা একটা লম্বা শক্ত দড়ির সঙ্গে। মুখের মধ্যে ন্যাকড়া গোঁজা। লম্বা অন্য প্রান্ত একটা গাছের মগডালের ওপর দিয়ে ছুড়ে নিচে নামানো হয়েছে। তারপর দড়ির এ মাথা টানা হয়েছে এমন করে যে, দড়ির ও মাথায় বাঁধা মতিন উঠে গেছে গাছের মগডালে। তারপর দড়ির খালি মাথাটা গাছের গোড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় এক ঘুঘু ডাকা দুপুরে, শঠিবাড়ির মানুষজন তাকে আবিষ্কার করে গাছের মগডালে। প্রথমে দেখে ফতের দাদি বুড়ি। শুকনো ডালপাতা কুড়োনোর জন্য গিয়েছিল ওই জংগলটায়। দেখে সঙ্গে সঙ্গে ইয়া নফসি ইয়া নফসি বলে দৌড়ে ফিরে এসেছে নিজ ঘরে। বুকের মধ্যে থুতু দিয়েও তার শরীরের কাঁপুনি আর যায় না। তারপর দেখেছে প্রাইমারি স্কুলের কতোগুলো ছেলে, যারা সেখানে গিয়েছিল বেতফলের সন্ধানে। তারা সবাই দৌড়ে স্কুলে ফিরে এসেছে, এরমধ্যে ভীতু টাইপের একজন, খোঁড়া গণেশ, প্যান্ট ভরে মুতে দিয়ে স্কুলে বিশাল খবরের জন্ম দিয়েছে।

এরপর এ-কান ও-কান। রাষ্ট্র হয়ে যায় সারাগঞ্জ।

মতিনক পরী ধরছে বাহে। পরী তাক গাছের ডালত উড়ি নিয়া গেছে।

এখন মতিনের বন্ধুরা দৌড়ে আসে। তারা একা একা ওখানে যেতে সাহস পায় না। কেননা ওই জংগলটা পরিচিত কালিতলা হিসেবে, ওখানে আগে নিশ্চয় কালিমন্দির ছিল, এখন পতিত, সেখান থেকে আরো খানিক দূরে, মরানদীর পাড়টায়, আগে যেখানে নদী ছিল, এখন সরে গেছে, সেখানে মড়া পোড়ানো হতো। মসজিদ থেকে ইমাম সাহেবকে ডাকা হয়। জীন-ভূত তাড়ানোর তাবিজের ব্যাপারে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ, তারপর সবাই মিলে তারা যায় অকুস্থলে।

ইমাম সাহেব ঘটনা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে, এ নিশ্চয় পরীরই কাজ আর মতিন উদ্দিন

নিশ্চয় তুলা রাশি। দড়ির অন্য মাথা গাছের গোড়া থেকে সাবধানে খুলে আস্তে আস্তে ঢিলা দিলে মতিন আকাশ থেকে নেমে পড়ে। ইমাম সাহেব ছাড়া কেউ তাকে স্পর্শ করতে সাহস পায় না। ইমাম সাহেব মতিনের মুখ থেকে ন্যাকড়া বের করার আগে দেখে নেন বেঁচে আছে না মারা গেছে, পুলিশ কেস হলে হাত না দেওয়াই উত্তম। বেঁচে আছে দেখে তিনি মুখ থেকে কাপড়ের গোঁজ অপসারণ করেন। কিন্তু মতিন সাড়া দেয় না। ইমাম সাহেব তার চোখে-মুখে জলের ছিটা দেন, মাথায় পানি ঢালতে থাকেন, খানিক পরে মতিন চোখ মেলে চায়।

কিন্তু সে কোনো কথা বলে না। তাকে বিহ্বল দেখায়। তার শরীর কাঁপতে থাকে। তখন তাকে মসজিদের বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হয়। মসজিদের চাটাইয়ে শুতে বলা হয়। সে উঠে দৌড়ে বাইরে চলে যায়।

এরপর বহুদিন সে কারো সঙ্গে কথা বলেনি। ইমাম সাহেব একদিন তার পরীকে ঘরেও নামান। রাতের বেলা, মতিনদের খানকা ঘরে বসে পরী নামানোর আয়োজন। পাঁচটা মোমবাতি জ্বালানো হয়। এছাড়া ১৪ ছটাক ওজনের একটা সাদা মোরগ বিশেষভাবে সংগ্রহ করে আনা হয়। ইমাম সাহেব মোরগ জবাই করে তার রক্ত দিয়ে সাদা প্লেটে আয়াত লেখেন এবং তা সাদা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলেন।

মতিনকে দুজন মৌলভী সাহেব ধরে রাখে। এছাড়া ঘরভর্তি আগ্রহী লোকজন পরম কৌতূহলে ও উত্তেজনায় শ্বাসবন্ধ করে বসে থাকে।

তখন ৫টি মোমবাতির ৪টি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হয়। একটিই জ্বালানো থাকে।

হুজুর বলেন, তুমি জীন হও, পরী হও, এই ঘরে আসো। তুমি কি আসছো ?

মতিন বলে, হ্যাঁ। আসছি।

তুমি মরদ না জেনানা ?

মতিন বলেন, আমি জেনানা।

তুমি ওকে ধরছো কেন ?

ও আমার সঙ্গে বেয়াদবি করছিল।

কী বেয়াদবি করছিল ?

ও আমাকে লাথি দিছিল। মান্দার গাছের ছায়ার সাথে আমি শুত্যা ছিলাম। ও আমার শরীলত পা দিছে।

ও জানবে কী কর‍্যা যে তুমি ছায়ার সাথে শুয়া আছো ?

ও আরেক দিন আমার গর্তত মুতছে।

কোন গর্তত তুমি থাকো। ও জানবে কী কর‍্যা ?

না। ও আমার পিছে লাগছে।

তুমি থাকো কোটে ?

বাজপোড়া তেঁতুল গাছত।

আমাকে কি তুমি ওস্তাদ মানো ?

জি মানি। আপনে বড়ো হুজুর। আপনাক ওস্তাদ মানি। আর ওস্তাদ মানি ওস্তাদ শামসুকে।

আমাকে ওস্তাদ মানলে তুমি আমার কথা শুনবা ?

হ। শুনবো।

তুমি এই শিশিটার মধ্যে ঢোকো।

না। আমি একে ছাড়বো না।

তুমি ছাড়বা। আমি তোমার ওস্তাদ।

না। আমি ওকে ছাড়বো না।

ছাড়ো। নাইলে তোমাক মারধর করবো।

তাও ছাড়বো না।

তখন হুজুর একটা ঝাড়ু হাতে নেন। মন্ত্রপড়া পানি ছিটিয়ে দেন মতিনের গায়ে। তারপর ঝাড়ু দিয়ে মতিনকে পেটাতে থাকেন।

ছাড়বা ?

হ। ছাড়বো।

ঢোকো। শিশির মধ্যে ঢোকো।

মতিন অজ্ঞান হয়ে যায়। ইমাম সাহেব শিশিটার মুখ ছিপিবদ্ধ করে তাকে একটা কৌটার মধ্যে পুরে রাখেন।

এরপরেও মতিনের আচরণ খুব স্বাভাবিক হয় না। সে প্রায়ই একা একা রাতের বেলা ঘর থেকে বের হয়ে যায়। যায় ছায়াকুঞ্জের সামনে। ঢিল ছুড়ে মারে বাড়িটাতে। টিনের চালে ঢিল পড়ে ধুপধাপ শব্দ হয়।

কায়সুলের কাছে একদিন আসে মতিন। খুব শান্তশিষ্ট তার আচরণ। তবে চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। বলে, ছার, আমার ওপর নজর রাখতেছে তো। এইজন্য আসতে পারি না। তবে ছার ব্যবস্থা নিচ্ছি। কঠিন অ্যাকশন। ওস্তাদ শামসু পালাবার পথ পাইবে না। ছায়াকুঞ্জ তাকে ছাড়াই লাগবে। শামসু ছায়াকুঞ্জ ছাড়লেই আমাক ছার আপনার শ্বশুরবাড়িত যাওয়া লাগবে। ঠিকানা দ্যান তো স্যার। সাবিনার সাথে তার আগত দেখা করা যাবার নয়। কথা দিছি তো।

কায়সুল মতিনের কথা খুব পরিষ্কার বুঝতে পারে না। তবে শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটাও সে তাকে দেয় না।

ছার ঠিকানাটা দিবেন না ছার।

ছায়াকুঞ্জ তো ওস্তাদ শামসুর দখলে মতিন। এখন ঠিকানা দিয়ে কী করবে ?

তা অবশ্য ন্যায্য কথা। ঠিক আছে, ওস্তাদ শামসুর ঠ্যাংটা ভাঙি তারপর আসিবো। সাবিনাকে আমি কথা দিছি তো।

মতিন উদ্দিন চলে যায়। আড়াল থেকে রেজিনা সব কথা শুনেছে। তার কেমন ভয় ভয় লাগে। মতিনকে পরী ধরেছে— একথা রেজিনাও শুনেছে। পরী যে তাকে এক হাঁড়ি সোনার মোহর দিয়ে গেছে, একথা জানার পর থেকে মতিনের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধও জন্মেছে রেজিনার মনে। কিন্তু নিজেকে সে বুঝিয়েছে, পরীর সোনা কোনো কাজে লাগে না। বরং তার ওপর লোভ করা মানেই বিপদ ডেকে আনা।

এখন মতিনের মুখে সাবিনার নাম শুনে সে খুবই ভয় পায়। সে তার বাড়িতে চিঠি লিখে দেয়— মা, সাবিনার বিবাহ স্থির করো। তাহার বিবাহ দিতে দেরি করা মোটেও উচিত হইবে না। আমার এই অনুরোধ অবশ্য অবশ্যই রাখিবা। কেন আমি তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি, তাহা তুমি জানিতে চাহিও না। তাহা অতি গোপনীয় ব্যাপার। তবে শাহেদ ভাইজানের ব্যাপারটাওতো আছে। তাহা ছাড়াও আরো ঘটনা আছে। চিঠিতে তাহা লেখা যাইবে না। লেখা উচিতও নহে।

সেদিন সাবিনার মনটা ভালো ছিল। এর কারণটা কিছুটা অভিনব। সে রংপুর বেতারে চিঠি লিখেছিল অনুরোধের গানের অনুষ্ঠানে। একটা অনুরোধের গান শুনতে চেয়ে। গানটা অবশ্য একটু বিশেষ ধরনের— তোমরা ভুলে গেছো মল্লিকাদির নাম, সে এখন ঘোমটা পড়া কাজলবধূ দূরের কোনো গাঁয়, যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরিয়ে আনা যায়। কাল রাত নয়টায় যখন রংপুর রেডিওর অনুরোধের আসর শুরু হলো, তখন সে তাদের ট্রানজিস্টারটা নিয়ে ঘরের মধ্যে একা। হঠাৎ শুনতে পেলো, এ গানটা শুনতে চেয়েছেন রাধাপুর থেকে মতিন ও সাবিনা...। তারপর বেজে উঠলো গানটা— তোমরা ভুলে গেছো মল্লিকাদির নাম। মতিনের নামটা সে ইচ্ছা করে যুক্ত করে দিয়েছিল, যাতে মতিন বুঝতে পারে, এই সাবিনা কোন সাবিনা। গানটা যখন বাজছিল, তখন অকারণ অশ্রু এসে তার বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছিল।

পরদিন সকাল বেলায় ঘটে আরেকটা ভালো ব্যাপার। সাবিনার একটা ডেকি মুরগি ছিল। বাদামি রঙের। মুরগিটা দেখতে সুন্দর বলেই সাবিনা এটাকে তার নিজের বলে দাবি করে এসেছে এবং তার বাড়ির সবাই সেটা মেনেও নিয়েছে। তবে মুরগিটার বদনাম ছিল সে ডিম পাড়ে না।

গত ক'দিন ধরে মুরগিটা নিখোঁজ। সাবু'র মুরগি হারায়া গেছে— এই ছিল বাড়ি জোড়া শোক আর আলোচনার বিষয়। আজ সকালে গোলাঘরে ঢুকে সাবিনা দেখতে পেলো— তার মুরগিটা ধানের ডুলির মধ্যে বসে আছে। হাতে ধরে তুলতেই কক কক করে উঠলো, ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, অনেকগুলো ডিম। ওরে পাজি মুরগি, গোপনে ডিম পেড়ে বাচ্চা ফোটানো হচ্ছে। খুশিতে সাবিনার তো আটখানা হবার যোগাড়।

খুশিতে সাবিনার আকাশ আলোকিত। যেনো তার পাখা গজিয়েছে। আজ সে প্রজাপতি। সে গুন গুন করে গান গায়, তোমরা ভুলে গেছো মল্লিকাদির নাম।

এমন সময় সাইকেলে ঘণ্টা বাজিয়ে আসে ডাকপিয়ন। চিঠি আছে গো চিঠি— বুড়ো পিয়ন সুরেলা গলায় হাঁক পাড়ে। চিঠি। বুকের মধ্যে অজানা আশা আর আশঙ্কা জাগে, দৌড়ে

খুলিতে যায় সাবিনা। চিঠিটা নেয়। তার বাবার নামে চিঠি। বুবু লিখেছে।

চিঠিটা খোলে। পড়ে। প্রজ্বলিত শিখা যেন নিভে যায় দপ করে। বুবু এসব কী লিখেছে। কেনো লিখেছে? বুবু কি তাকে এখনো সন্দেহের চোখেই দেখে।

চারদিকের আলোকিত আকাশ ঢেকে যায় অন্ধকারে। আনন্দিত একটা দিন পরিণত হয় বিষাদের নির্ঘুম কষ্টকর রাত্রিতে।

পঁচিশ তারিখে আবার বসছে আদালত। জজ সাহেব বিবাদী পক্ষকে বলেছেন আদালতে হাজির হতে, তাদের যদি কোনো জবাব থাকে, তাহলে সেটা পেশ করতে। পঁচিশ তারিখের জন্যে কায়সুল প্রতিটা মুহূর্তে অপেক্ষা করে, একটা করে দিন যায়, আর কায়সুলের মনে হয় বিজয় কাছে আসছে। চলে আসছে হাতের মুঠোয়।

ভোরবেলা মর্নিংওয়ার্কে যাওয়ার অভ্যাসটা অবশ্য কায়সুলের যায়নি। শরৎকাল। ভোরগুলো অপূর্ব হয়ে নামে। সুন্দর বাতাস বয়। অবশ্য মাঝেমধ্যে আকাশ মেঘে ঢেকে থাকে, বাতাস থাকে না, গুমোট গরমে হাসফাস করে কার্তিক। তালপাকা গরম পড়ে। তালের কথা মনে পড়লে কায়সুলের মনে পড়ে বাবুই পাখির বাসার কথা। নিজ হাতে গড়া মোর পাকা ঘর খাসা। আহা। তার ঘরখানি আজ দখল করে রেখেছে কোন সাপ ? কী তার অপরাধ!

রাস্তায় দেখা হয় দুধঅলার সঙ্গে— প্রফেসর সাব, আপনের বাড়িটা ফেরত পাইলেন না। মামলা করছেন। খবর কী মামলার।

কায়সুল বলে, এই তো পঁচিশ তারিখ এসে গেলো। কাল গিয়াছিলাম রংপুরে। উকিল সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এলাম। পরামর্শ করে এলাম। খুব বড়ো উকিল আমার পক্ষে ফাইট করছেন। সব শুনে তিনি বলেছেন, টাকা নেবেন না। বাহে এই দুনিয়ায় এখনো ভালো মানুষ আছে। বিচার-আচার উঠে যায়নি। পঁচিশ তারিখেই ফয়সালা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। বদমাশগুলো যাবে নাকি। ওরা কাগজপত্র পাবে কোথায় ? জাল কাগজের তো একটা ভিত্তি লাগে।

দুধঅলা চলে যায়। সেটা টের পায় না কায়সুল। বকবক করতেই থাকে।

পঁচিশ তারিখে সকালবেলা রওনা হয়ে সকাল সকাল রংপুর পৌঁছে যায় কায়সুল। কাচারি বাজারে গিয়ে বোঝে বড্ড তাড়াতাড়ি আসা হয়ে গেছে। এখন সে কী করবে ? মকসেদ

আলী কবিরাজের সাপ খেলাও তো রাস্তায় শুরু হয়নি।

কায়সুল যায় কেরামতিয়া মসজিদে। ওখানেই হযরত কেরামত আলীর (রঃ) দরগা শরিফ। কায়সুল দরগায় বিশ্বাস করে না। তবু সে দরগার ভেতরে ঢোকে। গেট থেকে একটা মোহিনী আগরবাতিও কেনে। ভেতরে গিয়ে নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। মনে মনে প্রার্থনা করে, আমার সম্পত্তি যেন আমি ফিরে পাই।

ছায়াকুঞ্জের সিমেন্ট তো আমার রক্ত। তার ইট আমার মাংস। তার রড আমার হাড়। আমি নির্বিবাদী কলেজ শিক্ষক। আমার এ সম্পত্তি কেন বেহাত হবে। কেন সত্যের জয় হবে না। কেন অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে না। তার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ে।

আজ অবশ্য কায়সুলের মামলাটা তাড়াতাড়িই আদালতে ওঠে। সকাল ১০টার সময়। আজিজার এডভোকেট বলেন, প্রফেসর সাহেব, আজ আর তকলিফ হবে না। ৫ মিনিট পরেই চলে যেতে পারবেন।

সত্যি তাই হয়। কায়সুল মনে মনে আশা করেছিল আজ ওস্তাদ শামসুকে কাঠগড়ায় দেখা যাবে; কাঠগড়ায় উঠে শামসু উল্টো-পাল্টা বলছে, কিংবা ক্ষমা চাইছে— এরকম একটা কাল্পনিক দৃশ্য কায়সুলের মানসচক্ষে ভেসে ওঠেছে বার বার। কিন্তু কার্যত এসবের কিছুই হয় না। ওস্তাদ শামসুর পক্ষে একজন উকিল এসেছেন। তিনি বললেন, আমরা জবাব দেবো। সব বৈধ কাগজপত্র আমার মক্কেলের আছে। এজন্যে আমাদের কিছুদিন সময় দরকার। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে বিচারক সাহেব আদালতের পরবর্তী তারিখ দিয়ে দেন। কায়সুল হিসেব করে দেখে, পরের তারিখ পড়লো দেড় মাস পর। তার মুখ চুন হয়ে যায়। ব্যাটা শামসু সময় চাইলো, আর আদালত দিয়ে দিলো। ও জবাব দেবে। দেবেটা কী? ওর কাছে জবাব থাকলে তো।

গোলাপ উকিলের হাতে আরো কিছু টাকা তুলে দেয় কায়সুল। এডভোকেট আজিজার রহমান না হয় ফি নেবেন না, অন্যদের তো আর খালি হাতে ফেরানো যায় না। চা-পান খাওয়ার টাকাটা অন্তত দিতে হয়।

তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়েও কায়সুলের বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না। সে হাঁটতে থাকে। রংপুর মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সামনে যায়। ফলের দোকানে কতোগুলো আপেল সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা। তার মনে হয়— রেজিনা সন্তানসম্ভাবা, কিন্তু তার যত্নআত্তি ঠিকভাবে করাই হচ্ছে না। কায়সুল এক হালি আপেল কেনে বউয়ের জন্যে। তারপর যায় শাড়ির দোকানে। এটা-ওটা শাড়ি দেখে। একটা শাড়ি পছন্দও হয়। পাবনা স্টোরে। সুতির শাড়ি। চওড়া কারুকাজ করা পাড়। দর কষাকষি করে একটা শাড়িও কিনে ফেলে। তারপর রওনা হয় শঠিবাড়ির উদ্দেশে।

রেজিনা তখন বিছানায় গড়াচ্ছিল। ভাতঘুম। স্বামী ঘরে নেই, তার করারই বা কী আছে? শাহিনের মা খালাম্মা এসে অবশ্য একবার খোঁজ নিয়ে গেছেন। আজ যে তার স্বামী দেরিতে ফিরবে সে জানে। এর আগে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে ফিরেছে রাত দশটায়। মানুষটার জন্যে ভীষণ মায়া হয় তার। একটা জিনিস যদি তুমি নিজ হাতে গড়ো, তার ধ্বংস তুমি সহ্য করতে পারবে না। তার ওপর ছায়াকুঞ্জের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ন্যায়-

অন্যায়ের প্রশ্ন। এটা তো শুধু লাভ-ক্ষতির ব্যাপার না। দেখা যাক, আজ মামলার কী ফল হয়। লোকটা তো গেছে বড়ো আশা নিয়ে।

দরজায় শব্দ হয়। রেজিনা উঠে দরজা খোলে। তার চোখ এখনো ঘুমে ঢুলু ঢুলু।

কায়সুল দরজা বন্ধ করে দেয় ভেতর থেকে। জড়িয়ে ধরে স্ত্রীকে। অনেকক্ষণ ধরে আলিঙ্গনের মধ্যে বেঁধে রাখে তাকে। বুকের সঙ্গে মিলিয়ে রাখে বুক। তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, তোমার জন্যে চারটা আপেল এনেছি। এখন তো তোমার একটু শরীরের যত্ন দরকার।

সে কথা শুনে চোখে জল আসে রেজিনার। সে যে গর্ভবতী, প্রথমবারের মতো গর্ভবতী—ব্যাপারটায় একদম গুরুত্ব দিচ্ছে না কায়সুল। অথচ এই সময়টায় মেয়েদের মন দুর্বল থাকে, এই সময়টায় স্বামীর কাছ থেকে একটু যত্ন, একটু অতিরিক্ত ভালোবাসা মেয়েরা প্রত্যাশা করে।

কায়সুল তাকে সে সবের কিছুই দেয়নি। এক ছায়াকুঞ্জ ছায়াকুঞ্জ করে সে সব ভুলে গেছে।

কাঁদো কেন ? কায়সুল জিজ্ঞেস করে।

কেন কাঁদি, সেটা তুমি বুঝবে না। তুমি তো একটা পাষাণ।

পাকা ঘর। জানালায় হলুদ পর্দা। একটু আগেও ঘরের মধ্যে কায়সুলের অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল। এতোক্ষণে চোখ সয়ে গেছে। এখন অনেকটাই আলোকিত লাগে ঘরখানি। চাউল ধোওয়া পানির মতো আলোয় ঘুম ঘুম বউটিকে দেখে তার খুব আদর আদর লাগে। সে বলে, দ্যাখো, তোমার জন্যে কী এনেছি।

কী ?

দ্যাখোই না। শাড়ির প্যাকেট ছেঁড়ার শব্দ হয়। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা সর্ষে রঙের সুতির শাড়ি।

কেমন ?

সুন্দর। কার জন্যে ?

কার জন্যে আবার। আমার সুন্দর বউটার জন্যে।

সুন্দর না কচু।

এখনই পরো।

ব্লাউজ লাগবে না।

না ব্লাউজ ছাড়াই পরো।

না। পরে পরবো। মাড়অ্যালা শাড়ি পরতে পারবো না। জোলার হাতের ময়লা লাগ্যা আছে না।

থাকুক। পরো।

আচ্ছা। তুমি ওই দিকে মুখ কর‍্যা থাকো।

কায়সুল মুখ ফিরিয়ে রাখে। রেজিনা শাড়িটা পাল্টে নিতে চায়। পরনের শাড়িটা খোলে। কায়সুল এদিকে তাকায়। শুধু সায়া আর ব্লাউজ পরা রমণীকে দেখতে এমন অদ্ভুত দেখায় কেন। কেমন যেন রক্তে আগুন ধরানো জংলি এই রূপ। তার মনে হয়, বাঙালির পূর্ব পুরুষরা হয়তো এমনি ঘাঘরা চোলি পরা বাইজি নাচাতো। হয়তো সে কারণেই এই বেশ এমন আদিম মনে হয়।

নতুন শাড়িটা পরে ফেলে রেজিনা। বাসায় পরা সায়া-ব্লাউজের সঙ্গে। তার গায়ে নতুন শাড়ি ফুলে থাকে। কায়সুলের কাছে মনে হয় নৌকার পাল।

সুন্দর লাগছে।

যাও। ব্লাউজ তো ম্যাচ করে নাই।

তাহলে এই ব্লাউজ খোলো। এমনিই ভালো লাগবে।

রেজিনা এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় না। কায়সুলকেই তাই তৎপরতা দেখাতে হয়। ব্লাউজ সরাবার ফলে নগ্ন বাহু, কাঁধ, বড়ো ফরসা, বড়ো সুন্দর দেখায়।

দিনের বেলায় তারা বিছানায় লুটোপুটি করে। জানালায় হলদে পর্দা। একটা চড়ুই পাখি আসে যায়, তাদের সেদিকে খেয়াল নেই।

তারপর তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম থেকে জাগে পড়ন্ত বিকেলে। দুজনই। রেজিনা বলে, হ্যাগো, তুমি ভাত খেয়েছো ?

না।

করেছো কী। হ্যাঁ। ভলো কথা। মামলার কী হলো। আজ যে বড়ো খুশি খুশি দেখাচ্ছে তোমাকে।

কায়সুল চুপ করে যায়। একদম চুপ।

রেজিনা তাকে আর কোনো প্রশ্ন করার সাহস পায় না।

খালাম্মা (শাহিনের মা) হঠাৎই এসে দাঁড়ালেন দরজায়। প্রবেসারের বউ, তোমার সাথে একটা কথা আছে গো।

জি খালাম্মা। আসেন।

খালাম্মা ভিতরে আসেন। বিছানায় বসেন। একটা কথা বলবার লাগিয়া আসলাম। দরকারি

কথা। ক্যামন কর‍্যা বলি। আবার না বল্যাও পারি না।

জি খালাম্মা বলেন।

তুহিন আরব দ্যাশ থাক্যা চিঠি লেখছে আমার বড় ছেলে তুহিনের কথা কচ্ছি। আগামী মাসত সে দ্যাশে আসবে।

সে-তো খুশির কথা খালাম্মা।

হ। আল্লায় দিলে খুশির কথা। কতদিন ছেলেটাকে দেখি না। খুশির কথা নয়? কী কন তোমরা। কিন্তুক আমি কই, ব্যাটার বয়স হইছে। বিয়াও তো দেওয়া লাগে। তোমার কাছে মেয়ে থাকলে কয়ো।

আচ্ছা। মেয়ে দেখা যাবে। আপনার সোনার ছেলে। মেয়ের অভাব হবার নয়, রেজিনা মনে মনে ভাবেও একথা। বুড়ি তাহলে আমাকে মেয়ে দেখতে বলছে। তার জন্যে এতো ভূমিকা। এতো ভণিতা। তবে কি বুড়ি সাবিনার কথা মনে মনে ভাবছে? সাবিনার একটা বিয়ে দেওয়া জরুরি। মেয়েটার স্বভাবের মধ্যে একটু সমস্যা আছে। বিয়ের পানি না পড়লে ও থিতু হবে না। কিন্তু শঠিবাড়িতে ওকে আনা কি ঠিক হবে? নাকি বিয়ে করে তুহিন বউ নিয়ে চলে যাবে আরব দেশে। তাহলে তো ভালোই হয়।

তা কথা কি জানো বউ, বাড়িত ছেলে আসবে। তারই তো টাকা-পয়সা। তারই বাড়ি। আস্যা যদি ঘর না পায়। তোমরা কি এই মাসের মধ্যে বাড়ি বদলাবার পারবা ?

ও। এই কথাই তাহলে আসল কথা। তাই তিনি সংকোচ করছেন। তা বাড়ি তো বদলান লাগলে বদলাতে হইবে। বিপদের দিন আশ্রয় দিছলেন। সেটাই তো কতো বড়ো কথা। কে করে খালাম্মা। আপনার উপকারের কথা কি এই জীবনে ভুলবার পারবো। বলবো আমি প্রফেসরকে। বাসা একটা খুঁজ্যা পাওয়াই লাগবে।

তুমি কিছু মনে করলা না তো বউ।

না না। কী আশ্চর্য কথা। মাইন্ড করবো কেন।

বিকাল বেলা কলেজ থেকে আসে কায়সুল। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢোকে। তখন এক কাপ চা নিয়ে আসে রেজিনা।

কী ব্যাপার। আজ চা না বলতেই চা।

বাহ। তোমাক বুঝি আমি চা বানায়া খিলাই না।

চিনির নয়, গুড়ের চা।

ঘরে বুঝি চিনি নাই ?

না। গুড়ের চা খারাপ লাগতেছে ?

না। অন্য রকম মজা।

শোনো, তোমাকে একটা কথা কবো। খালাম্মা আসছিলেন। বাসা ছাড়তে কলেন।

কায়সুল গম্ভীর হয়ে যায়।

কলেন বলে তার বড়ো ছেলে আসতেছে আরব দেশ থাক্যা। বিয়াও দেবেন ছেলের।

তাইলে তার ঘর দরকার। তাই না ?

হ্যাঁ। তা দরকার।

শোনো। আমাক মেয়ে খুঁজতেও কলেন। কওতো, মেয়ে কোটে পাই ?

মেয়ে। কী জানি। কায়সুল পুরো উদাস এবং হতোদ্যম। কবে ছাড়তে হবে বাসা ?

সামনের মাসতই নাকি তুহিন আসবে।

ও। তাহলে তো ছাড়তেই হবে। অন্যের বাসা। নিজের একটা বাসা থাকা এই জন্যে কতো ভালো। এইসব বুঝেই তো আমি একটা বাসা করেছিলাম জিনু।

ওগো। আমাদের সাবিনাকে কি পছন্দ করবে ?

কী। সাবিনাকে। কী জানি। করতেও পারে।

বলবো!

বলবে। নাকি দেখবে ওরা নিজেরাই বলে কি-না।

সাবিনার কথা যদি ওদের মনেই না আসে।

তাহলে তো ওকে আবার আনতে হয়। ওকে সামনে দেখলেই মনে পড়বে।

না। তা করা যাবে না। আমার বোনের একটা দাম আছে না। এটা রেজিনা মুখে বলে বটে। মনের কথা হলো আমার পোয়াতি অবস্থায় ওর মতো ডেঞ্জারাস মেয়েকে আমি তোমার সামনে রাখবো না। কিছুদিন আগে ডাক্তারের কাছে আবার যেতে হয়েছিল রেজিনাকে। সেই মোটা আয়ার সঙ্গে আবার কথা হয়েছে। সে বলেছে, আপনার না একটা সেয়ানা বোন বাড়িত আছিল। তাকে বাপের বাড়িত পাঠায়া দিবার কছি। দিছেন ?

হ্যাঁ। দিছি।

ভালো করছেন। পুরুষ মানুষক বিশ্বাস নাই। আর বউ পোয়াতি হলে পুরুষ মানুষগুলার মতিগতি খারাপ হয়া যায়। পুরুষ মানুষ হইল অক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ। খুব সাবধান। খুব।

সেদিন থেকে কায়সুল বাসা খুঁজছে। কলেজে সব শিক্ষকদেরকে সে বলে রেখেছে, একটা বাসার খোঁজ পেলে তারা যেন তাকে জানায়। ক্লাসে ছাত্রদেরও বলেছে, আমার একটা বাসা দরকার। ভাড়া নেবো। তোমাদের খোঁজে থাকলে বলো। বুঝলে, আমি হলাম মন্দকপাল মানুষ। নিজের বাড়ি থেকেও নেই। এখন এক বাসা থেকে অন্য বাসায় ঘুরে মরি। তোমরা যখন বড়ো হবে, এমপি হবে, মন্ত্রী হবে, জজ-ব্যারিস্টার হবে, তখন এই ব্যাপারটার একটা বিহিত তোমরা করো। আমার ব্যাপারটার কথা কিন্তু বলছি না। এই যে সমাজে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ব্যাপারটা। আর আইনের প্যাঁচ। এতো লম্বা প্রসেস হলে হয় ?

শঠিবাড়ি ছোট্টো একটা গঞ্জ। থানা সদরও নয়। এখানে একটা বাসা ভাড়ার জন্যে পাওয়া সহজ নয়। জাপানে কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে যারা গেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ি বানিয়েছে বটে। কিন্তু তাদের বাড়ি বড়ো, ভাড়া বেশি। বেসরকারি কলেজের শিক্ষকতার অনিয়মিত

টাকায় তা ভাড়া নেওয়া কঠিন।

কিন্তু একটা বাসা খুঁজে পেতেই হবে। রেজিনাও খুব অস্থির হয়ে পড়েছে এই বাড়ি ছাড়ার জন্যে। রেজিনার সঙ্গে খালাম্মার সামান্য একটা মন কষাকষিও হয়েছে। মেয়েলি কৌতূহলের তাড়নায় রেজিনা গিয়েছিল খালাম্মার কাছে। একথা-সেকথাই পেড়েছিল সাবিনার কথা। বলেছিল, আমার ছোটো বোনটার জন্যে একটা পাত্র খুঁজতেছি খালাম্মা। মনের মতো পাত্র পালে বোনটাকে বিয়া দিয়া দেবো। আপনার খোঁজে পাত্র আছে?

না পাত্র কোটে পামো বউ। ভালো পাত্র পাওয়া কি মুখের কথা।

তা ঠিক। বিয়াশাদী হইল কপালের লেখন। বেহেশতে যখন বিয়ার ফুল ফুটিবে, তখন বিয়া হইবেই। যার সাথে যার জোড় আল্লা লিখা থুছে।

হ বউ। ঠিক কছো।

আপনার বড়ো ছেলের বউ পালেন ?

না। কোটে আর পালাম।

আমার বোনটা আবার বিদেশ যাবার চায় না। কয়া-বুলা ধরলে রাজি হয় কি হয় না।

এই সময় খালাম্মা আর নিজের চোপা প্রকাশ না করে পারেন না। বলেন, প্রবেসারের বউ। তোমাক একটা কথা কই। জানা-শোনা ঘরত তুমি তোমার বোনক বিয়া দিবার পারবা না। অচেনা ঘরত দেওয়া লাগবে। ওর তো চরিত্র ভালো না।

চরিত্র ভালো না। কী কন আপনে ?

ক্যা ? কথাটা কী এমন কলাম। সেনেমা দেখবার যায়। ব্লাকার তার গাওত হাত দ্যায়। শাহিনের বন্ধু মতিনের সাথে যে বেটিছোল কী করলো, চ্যাংড়া পুরা পাগলা হয়া গেলো। এগলা জানা-শুন্যা কেটা তোমার বোনক ঘরত তুলবে।

খালাম্মা। এটা আপনে ঠিক কন নাই। সেনেমা হলত কী হছে ? সাবিনা কি বেটা ছেলের বডিত হাত দিছে। সেটা কি ওর দোষ ? আর মতিনকে পরী ধরছে, সেটা সবাই জানে। এখন কন, আমার বোন মতিনকে গাছের মাথাত তুল্যা থুছলো।

রেজিনা উঠে চলে এসেছে বুড়ির সামনে থেকে। আর যায়নি। এ কী ধরনের কথা! আমার বোনের চরিত্র খারাপ।

একা একা এই কথাটাই মাঝে-মধ্যে ভাবে রেজিনা। সে তার বোনকে এ বাড়ি থেকে এক রকম জোর করেই বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাকে তার গভীর সন্দেহ। আবার বাইরের লোক যখন বোনের বিরুদ্ধে কথা বলছে, সে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ফেলছে। এই স্ববিরোধিতার মানে কী ? উৎস কী ? রেজিনা অবশ্য ভেবে কিনারা পায় না।

বাসা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না করে অবশেষে একটা পাওয়া যায়। একটা টিনের বড়ো ঘর। মেঝে পাকা। তবে বাঁশের বেড়া। তাই সই।

আবার দুটো ভ্যান গাড়ি ডেকে কায়সুল তার ছোট্টো সংসার তুলে ফেলে ভ্যানে। আবার বাসা বদলের পালা। আবার পাগলা শেয়ালের ছুটোছুটি।

নতুন বাসায় এসে কায়সুল কিন্তু ভুলে যায় শাহিনদের বাসাটার স্মৃতি। তার একটা দিনও ভুল হয় না। ভুল করে সে পা বাড়ায় না শাহিনদের বাড়ির দিকে। এই ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত লাগে কায়সুলের। সে যখন যেখানে থাকে, তখন সেখানকার। রাজশাহীর দিনগুলোর কথা যেমন তার মনেই পড়ে না। তার হলজীবন, হলের রুম— এসব তাকে স্মৃতি ভারাতুর করে না।

কিন্তু ছায়াকুঞ্জের কথা সে ভুলতে পারে না। এক মুহূর্তের জন্যেও না। তার নিজের জমি, নিজের বাড়ি কতোগুলো গুণ্ডাপাণ্ডা মাস্তান বদমাশ, ইচ্ছে করলো আর দখল করলো আর তাদের হয়ে গেলো ? আর সে পথে পথে ঘুরবে, ঘরহারা বেদুইনদের মতো, জিপসিদের মতো, বেদেনিদের মতো, বিচারের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে তাকেই। পাগলা কুত্তার মতো হয়ে ঘুরবে নিরীহ বিচারপ্রার্থী মানুষ। আর জুলুমবাজ জালেম থাকবে বহাল তবিয়তে। এই কি বিচার ?

রেজিনার কিন্তু নতুন বাসায় উঠে বার বার মনে পড়ে শাহিনদের বাসটার কথা। আর খালাম্মার কথা। আসার আগে খালাম্মার সঙ্গে তার একটু বেধেছে। ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাওয়া উচিত। মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়। রেজিনা অন্তত সেরকম মানুষ নয়।

রেজিনা যায় শাহিনদের বাসায়। খালাম্মার সঙ্গে গল্প করে। বলে, খালাম্মা। আপনাক দেখতে আলাম। আপনে আমার যে উপকার করছেন, সেটা কি আমি জীবনে ভুলা যাবার পারবো মনে করছেন। কিছু মনে করা থুয়েন না খালাম্মা। আপনারে সঙ্গে যদি কোনো খারাপ ব্যবহার করা থাকি।

না। খারাপ ব্যবহার কী। তুমিও কিছু মনে করিও না মা।

খালাম্মা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনার প্রফেসারের জন্যেও করবেন। আমার ছেলে হয় না মেয়ে হয় আল্লার ইচ্ছা, দোয়া করবেন।

আচ্ছা। মা।

তুহিন ভাইজান তো এই মাসই আসতেছে। আপনার তো এখন ফুর্তির দিন।

না মা। এই মাসত আসবার পারতেছে না। চিঠি লেখছে।

ও।

লেখছে বলে পরে সময় পালে আসবে। বিদেশ-বিভুঁইয়ের চাকরি তো। আসা কি সোজা।

তারা বসেছিল আঙিনায়। ছোটো টুলের ওপরে। খালাম্মার কাজের মেয়ে শায়লা একটা পিরিচে করে পান দিয়ে গেছে। রেজিনা সেই পান চিবুচ্ছে।

তুমি বসো মা। আমি আছরের নামাজটা পড়্যা আসি। খালাম্মা উঠে পড়ে।

আমিও যাই খালাম্মা। প্রফেসর আস্যা যাবে।

খালাম্মা নামাজ পড়তে যায়। তখন পরিচারিকা শায়লা, তার হাতে একটা ঝাঁটা, কাছে আসে।

যাইরে শায়লা। রেজিনা বলে।

আপা যাইবেন। আচ্ছা যান। সে গলা নামিয়ে বলে, আপা, আপনাক একটা কথা কই। আপনে কাউরে কয়েন না। আমি যে কছি সেটা তো কাকে কওয়া যাবাই নয়।

কী কথা। ক তাড়াতাড়ি। বাসাত যাওয়া লাগে।

বড়ো ভাইজান আরব দ্যাশ থাক্যা আসবে-টাসবে না। সব মিছা কথা। আসলে আপনাদেক তুল্যা দেওয়ার জন্য খালাম্মা বানায়া কছে।

যা তো। খালাম্মার দয়ার শরীল। উনি নিজের বাড়ি থাক্যা আমাদের তুল্যা দিবেন, মিথ্যা কবেন ক্যান ?

কছে কছে। ক্যান কছে জানেন। ইচ্ছা করা কয় নাই। উপায় আছিল না। শাহিন ভাই ঝামেলা করতেছে। বাথরুমের তো ছাদ নাই। ওই দক্ষিণের ঘরের জানলা দিয়া ভিতরের সব দেখা যায়। আপনে যখন গোসল করবার ঢোকেন, ডেলি শাহিন ভাইজান ওই জানলাত বস্যা থাকে। প্রত্যেক দিন সব দেখে।

বলে কী মেয়েটা এসব ? রেজিনা বাথরুমেই ভেজা কাপড় বদলেছে রোজ। পাকা বাথরুম, চারদিকে দেয়াল, ড্রাম কাটা লোহার দরজা, ভিতর থেকে ছিটকিনি আটকে দিলে বাইরে থেক কেউ দেখবে, তার কখনো মনেই হয়নি। তার মাথা ঝিমঝিম করে। শাহিন ছেলেটা তো খুব শান্ত আর ভদ্র। সে এরকম হতে পারে ?

আপা। খালি আপনার গোসল করা দেখছে— তা কলাম নয়, মোরটাও দ্যাখে। মুই টের পাও। কী করমো। ভিজা কাপড় তো বদলান লাগবেই। কিন্তুক ভাইজান মোর গাত কোনোদিন হাত দ্যায় নাই। কতোদিন একলা পাছে ঘরত, কিছু করে নাই। কিন্তু আড়াল পালে তাকায় থাকে। মানুষের স্বভাব কতো আজিব হয় না আপা।

তাই হবে। তাই হবে।

খালাম্মা টের পায়া আপনাকে বাসা ছাড়তে কছে। মানসম্মানের ব্যাপার। কাকে তো কবারও পারে না। আপনে আপা খালাম্মার উপর গোস্বা করেন না।

বিবাদী পক্ষ ছায়াকুঞ্জ মামলায় যখন জবাব দিলো, ততোদিনে পৃথিবী একবার প্রদক্ষিণ করে এসেছে সূর্যকে। এক শরৎ গিয়ে আরেক শরৎ আসি আসি। ঘাঘট নদীতে নতুন বর্ষার জল কানায় কানায় পূর্ণ।

পূর্ণ কায়সুল-রেজিনার ভাড়া করা ঘরও। তাদের একটা ছেলে হয়েছে, কায়সুল আশা করেছিল, মেয়ে হবে, নাম রাখবে ছায়া। কিন্তু তা হয়নি, হয়েছে একটা ছেলে। প্রথম ক'দিন কায়সুল একটু হতোদ্যম হয়েছিল, পরে অবশ্য সে একটা আশ্চর্য সমাধান বের করেছে। আরে ছেলের নাম কুঞ্জ রাখলেই তো হয়। তা-ই সে রেখে দিয়েছে। রেজিনা খুব আপত্তি করেনি। কারণ ডাকনাম একটা রাখলেই হলো। বাবু-সোনা চান বাপি মনি— যে যেভাবে পারে ডাকবে। কুঞ্জটুঞ্জ চলবে নাকি আপত্তি করেছিল ছেলের নানি। মেয়ের যখন নয় মাস, তখন রেজিনার মা চলে আসেন শঠিবাড়িতে, জামাতাগৃহে। মেয়ের প্রসব হয়ে যাওয়ার পরও আজ দুইমাস তিনি এখানেই আছেন। আছেন বলেই রক্ষা। বাচ্চাটার আর তার মায়ের যত্নআত্তি হচ্ছে। তো তিনি যখন শুনলেন যে, নাতির নাম রাখা হচ্ছে কুঞ্জ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে না-না হেন্দু নাম থোয়া যাবা নয় বলে আপত্তি জানালেন। কিন্তু কে শুনবে তার কথা। কায়সুল কি আর এই জগতের মানুষ? সে বলে, আম্মাজান, ঠিক সময়ে এলেন না। কী বাড়ি বানিয়েছিলাম আম্মা, বাড়ির সামনে বাগান ছিল, এই সময়ে বাগানে লাল হলুদ গোলাপ ফুটে ভরে থাকতে পারতো। একটা মানি প্লান্ট তুলে দিয়েছিলাম বারান্দায়, এতোদিন উঠে যেতো চালে। ফল-ফলাদির গাছ। সেগুন-সুপারির গাছ তো টাইম লাগে, সেসবও লাগিয়েছিলাম আর লাগিয়েছিলাম একটা সাইনবোর্ড— ছায়াকুঞ্জ; যদি দেখতেন। কায়সুল কথা বলে সামনে দাঁড়িয়ে, তবু বোঝা যায় সে এ জগতে নেই, অন্য কোনো খানে সে চলে গেছে, সেখান থেকে বলছে। তার কথা যেন মেঘলোকের ওপার থেকে ভেসে ভেসে আসছে।

ছেলের একটা ভালো নামও রাখতে হবে। দুটো খাসি জবাই করে আকিকা করতে হবে— কুঞ্জর নানি এসব বলেন কায়সুলকে। কায়সুল বলে, রাখবো-রাখবো, সামনের ডেটটা আগে পার করি, মামলার নেক্সট ডেটে ওরা যদি হাজিরা না দেয়, অ্যানসার না করে, মামলা একতরফা হয়ে যাবে। জমিটা-বাড়িটা পেয়ে যাবো। তখন তো শান্তিমতো আকিকা করতে পারবো। বড়ো অনুষ্ঠান করা যাবে। শঠিবাড়ি কলেজের সব টিচারকে বাসায় দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে পারবো।

ছেলের মুখ চুম্বন করে এবার বেরিয়েছিল কায়সুল। ছেলের বরাতে যদি বরাত খোলে।

কিন্তু কোর্ট থেকে সে বেরুলো একরাশ হতাশা নিয়ে। বিবাদী পক্ষ জবাব দিয়েছে। বিবাদী পক্ষের উকিল কী যে সব বললো, কায়সুল খুব বেশি কিছু বুঝলো না। এই জমি সে কিনেছে জমির আলী সরকারের কাছ থেকে, আর ওরাও দাবি করছে ওরা কিনেছে জমির আলী সরকারেরই কাছ থেকে। তারাই আগে কিনেছে, আগে থেকে খাজনা দিয়ে আসছে, দখল করে ভোগ দখলও করে আসছে। এই একতলা টিন ছাওয়া বাড়িটাও তারাই বানিয়েছে। রড-সিমেন্টের দোকানের মেমো-টেমো, রশিদ-টশিদও তাদের কাছে কিছু কিছু আছে। শুনে আকাশ থেকে পড়ে কায়সুল। এই পৃথিবীতে কি দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানানোও যায়? তা কি করে সম্ভব? টাকা থাকলে হয়। বদমায়েশি বুদ্ধি থাকলে। গায়ে জোর থাকলে। আদালত সব শুনলো, কাগজপত্র জমা নিলো পরীক্ষা করবে বলে, তারপর তিন মাস পর আবার তারিখ পড়লো মামলার। আজিজার এডভোকেট আজ আসেননি, গোলাপ উকিলই আজ চালিয়ে নেন। তিনি বলেন, ব্যাটারা জাল দলিলপত্র জমা

দিয়েছে— ফ্রড ফেস, চারশ' বিশ নম্বর, এদের বিরুদ্ধে খালি দেওয়ানি না ফৌজদারি মামলা করতে হবে। করবেন ?

করতে হবে ? তাহলে করবো। জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়তে হবে।

দাঁড়ান না। শুধু এই কোর্টে রায়টা হয়ে যাক। সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারি আদালতে কেস করবো। ক্রিমিন্যাল কোর্টে।

দাঁড়ান না। কথার কী ছিরি। আরে কায়সুল তো দাঁড়িয়েই আছে। আর কতো দাঁড়ানো যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো সে পার করে দিলো সোয়া এক বছর।

কায়সুলের আজকাল কিছু ভালো লাগে না। ক্লাসে মন বসে না। উদাস উদাস লাগে। ফাউন্টেনপেনের খাপ না লাগিয়ে পকেটে পোরায় দুটো জামার বুকপকেটে কালির স্থায়ী দাগ লেগে গেছে। এক ক্লাসের বদলে ভুল করে সে হাজির হয় অন্য ক্লাসে। কখনো কখনো ১২ টার ক্লাস নিতে হাজির হয় একটায়। ছাত্ররা হৈহল্লা করে ক্লাসে। তবু ডাকতে আসে না স্যারকে। আজকালকার ছাত্র। পড়াশুনায় মন নেই।

না। মামলার রায় তো আর কোনোদিনই হবে না। তাহলে কুঞ্জের নানী থাকতে থাকতেই কি ছেলের আকিকাটা করে ফেলা উচিত নয় ? হ্যাগো মা থাকতে থাকতেই আকিকাটা করবা না। রেজিনার এই অনুযোগের কি কোনোই দাম নেই। মা গেছে রান্নাঘরে, তাকে সহযোগিতা করছে রুনু। এটাও কুঞ্জর নানাবাড়ি থেকেই আমদানি করা, বয়স ছয় কি সাত। রেজিনা ছেলেকে আঁচলে ঢেকে স্তন্য পান করায়। এই সময় তাকে ভীষণ মনোযোগী আর আত্মবিশ্বাসী দেখায়, বেড়ার ফুটো দিয়ে বাইরের রোদ এসে বিছানায় আর রেজিনার শাড়ির আঁচলে পড়েছে। আলোর ফুটকিতে ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যেন মুড়ির চালনি।

আকিকা! হ্যাঁ আকিকাও করতে হয়। বলে চুপচাপ হয়ে যায় কায়সুল।

সেই আকিকা অবশ্য তখন আর হয় না। নাতীকে একটা সোনার চেইন গড়িয়ে দিয়ে নানী তার বাড়িতে চলে যান। বাচ্চা কাজের মেয়ে রুনুকে নিয়ে রেজিনা একই সঙ্গে চুল বাঁধা আর রাঁধা-বাড়ার কাজে পুনরায় নিমগ্ন হয়। তাদের আঙিনা জুড়ে বাচ্চার কাঁথা আর কাপড়-চোপড় রোদে শুকায়। আবার রেজিনার পোষা মুরগিরা চড়ে বেড়ায় উঠানে। খুলিতে, ঘরে। তারা মেঝে নোংরা করে। তিনটা পুঁই শাকের ডাল পুঁতলে সেগুলো লতায় পাতায় বড়ো হতে থাকে। আর রুনু, ছোটো কাজের মেয়েটি, পুঁইয়ের বিচি মেখে হাত লাল করে ঘুরে বেড়ায়। কায়সুল সেদিকে তেমন দৃকপাত করছে না দেখে সে বলে, খালু, আপনার জন্যে দোকান থাক্যা কিছু আনা লাগবে।

না। লাগবে না।

তাইলে আট আনা পয়সা দ্যান। চা পাতা কিন্যা আনি। লোকজন আসলে চা দেওয়া লাগে না। রুনু বলে।

লোকজনকে চা দেওয়ার দারকার কী। শুধু পান দিলে হয় না।

তাও হয়, তাই বুলি ঘরত চা পাতা থাকা লাগবে না। আচ্ছা তাইলে পান আনি। আট আনা পয়সা... সে হাত মেলে ধরে থাকে। তার হাতের লাল তালুর দিকে তবু তাকিয়ে দেখে না

খালু। সে হতোদ্যম হয়। পরে ঠিক করে খালুর শার্টের পেছনে পুঁই শাকের বিচির রং লাগিয়ে দেবে।

একদিন সকালবেলা রেডিওতে হঠাৎ করে কোরআন তেলাওয়াত আর দেশাত্মবোধক গান বাজিয়ে সারাদেশে মার্শাল ল' আসে। তখন, যারা জিয়াউর রহমানের অকাল মৃত্যুতে কেঁদে-কেটে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে এসেছিল, আর সেই কাঁচা পবিত্র আবেগ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে এসেছেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে, তারা খুবই অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্নচিত্তে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকীয় বক্তৃতা রেডিও এবং টিভিতে শুনতে থাকে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একজন বিচারপতির বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বলেন, দুর্নীতি ক্যান্সারের ক্ষতের মতো সারাটা দেশকে আক্রমণ করেছে আর অবস্থা এতোই শোচনীয় যে একজন মন্ত্রীর বাড়িতে আশ্রয় নেয় সাত খুনের আসামী।

শঠিবাড়ির মতো সামান্য লোকালয়ে এই সামরিক আইন তেমন কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করে না। কিন্তু ওই দিনই সাবেক সরকারি দলের নেতা-কর্মী-পান্ডা, যারা হাটবাজারের ইজারা নিয়ে যুব সংগঠন করছিল, সটকে পড়ে।

দেশের মানুষ বেশিরভাগই বিরক্ত হয় মার্শাল ল' জারিতে। যারা বিএনপি'র সমর্থক, জিয়ার বিচ্ছেদে কাতর— আর জিয়ার ভক্ত হওয়া অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয় কেননা তিনি তার আত্মীয়-স্বজন ভাই-ব্রাদারকে তার বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিতেন না, নিজের জন্য ভাঙা স্যুটকেস ও ছেঁড়া গেঞ্জি ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেননি, বিশেষত মহিলাদের চোখে তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন— তারা স্বাভাবিক কারণেই সামরিক শাসনকে অহেতুক বলে ভাবে। আর যারা বিএনপি'র সমর্থক নয়, তারাও খুশি হতে পারে না, তারা বিরক্ত যে যদি মার্শাল ল' জারির ইচ্ছাই ছিল, হুঃ মুঃ এরশাদ কেন তা ব্যয়বহুল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই জারি করলেন না। এতো অপব্যয়েরই বা কী দরকার ছিল। আর সাত্তার সাহেবকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে সংবিধান সংশোধনেরই বা কী প্রয়োজন ছিল।

শঠিবাড়ি কলেজে শিক্ষকরা গলা নিচু করে এই সব প্রসঙ্গ আলোচনা করে। তাদের গলা নিচু করার কারণ ছিল টিকটিকির ভয়।

তাদের কলেজের নোংরা দেওয়ালে সত্যি সত্যি বড়ো বড়ো টিকটিকি ঘুরে বেড়ায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নাকি মার্শাল ল'র বিরুদ্ধ মিছিল করেছে— বিবিসিতে এই খবর শুনে কলেজের ইংরেজির শিক্ষক আব্দুল বারী খুবই উত্তেজিত হয়। আর ভোরবেলাকার মর্নিংওয়ার্কে বেরিয়ে বারী সাহেব বলে, ছাত্ররা আছে বলেই দেশটা আছে, কী বলেন।

কায়সুল কিছু বলে না। আমগাছের ডাল ভেঙে মেসওয়াক বানিয়ে দাঁত মাজতে থাকে।

এরশাদ সাহেবের মার্শাল ল' টিকবে না, কী বলেন। ছাত্ররাই টেঁসে দেবে।

মুখ থেকে দাঁতনটা বের করে কায়সুল বলে, শোনেন। আমি কিন্তু এই মার্শাল ল'তে খুশি।

বলেন কী। আপনি খুশি। আমি তো জানতাম আপনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে রীতিমতো প্রগ্রেসিভ পলিটিক্স করতেন।

জি। করতাম।

তাহলে ? এরশাদ সাহেব রংপুরের লোক বলে ?

না। রংপুরের লোক গু খেলে আমিও গু খাই না।

মাইন্ড ইয়োর ল্যাংগুয়েজ প্লিজ। আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন ?

কারণ আছে, আপনার নিজের বাড়ি চোরছ্যাচ্ছড়-বদমায়েশরা দখল করে যদি আপনাকে রাস্তায় ঠেলে দিতো, আপনিও এভাবেই কথা বলতেন।

তা বটে।

আমি খুশি, কারণ মার্শাল ল'র পর থেকে ওস্তাদ শামসু গা ঢাকা দিয়েছে। আমি ঠিক করেছি, এই সুযোগে আমি মার্শাল ল' কোর্টে যাবো। আমার সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার এছাড়া আর কোনো পথ নেই।

তাহলে তো ভালোই। যান না।

কায়সুল রংপুরে রায়। এডভোকেট আজিজার রহমানের সঙ্গে দেখা করে। আজিজার রহমান বলেন, হ্যাঁ। এটা একটা গুড চান্স হতে পারে। মার্শাল ল' আসলে কোনো ল'ই না। এই হলো সুযোগ। সিএমএলএকে দিয়ে একবার লিখিয়ে নিতে পারেন, তাহলে এই জমি, এই সম্পত্তি কাল থেকে আপনার। শুধু এই জমি না, আপনি যদি বঙ্গভবন ঢাকা স্টেডিয়ামটাও আপনার নামে লিখিয়ে নিতে পারেন, ওটা আপনার হয়ে যাবে।

সিএমএলএ'র সঙ্গে আমি দেখা করবো কীভাবে ?

সেটা আপনার ব্যাপার।

এডভোকেট আজিজার রহমানকে দিয়ে সামরিক লাইনে অগ্রগতির আশা কম দেখে কায়সুল অন্য কোনো লাইন-ঘাট বের করা যায় কি-না, সে ব্যাপারে সচেষ্ট হয়।

অবশেষে একজন দালালের দেখা মেলে। তার জ্যাঠাতো ভাই নাকি আর্মির মেজর। মেজর সাহেব একটা ফোন করে দিলেই নাকি থানা বাপ বাপ করে যাবে এবং মুহূর্তেই কায়সুল তার সম্পত্তি ফিরে পাবে।

ব্যাপারটা কায়সুলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তার মনে হয় এডভোকেট আজিজার

রহমানের কথা, মার্শাল ল' আসলে কোনো ল' না। এখন যদি একজন মেজর বলে, এই সম্পত্তি কায়সুলের, তাহলে সেটাই সত্য।

দালালটি তার কাছে সাত দিন সময় চায়। সাত দিন পরে সে বলে, পরশু দিন মেজর সাহেবের বাসাত আপনাকে যাওয়া লাগবে। যাবার পারবেন তো।

আপনি সঙ্গে থাকলে পারবো।

আমি তো থাকবোই। ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বাসা।

তাতে কী। আর্মি অফিসারের বাসাতো ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই হওয়া উচিত। বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

তবে একটা ব্যাপার। স্যারের বাসায় একটা ফ্রিজ নাই। ফ্রিজ না থাকায় তার খুব মুশকিল হইছে। বরফ বানাতে পারছে না। বরফ বানাতে না পারায়...।

স্যারের বসায় ফ্রিজ নাই নাকি। থাকা উচিত ছিল। আমরা যারা কলেজের টিচার অর্থাৎ গুরু, অর্থাৎ গরু, তাদের বাসায় ফ্রিজের দরকার নেই। আপনি কখনো দেখেছেন, ফ্রিজের অভাবে গরুর দুধ নষ্ট হয়ে গেছে বলে বাছুরে খেতে পারে নাই।

না মানে। কছলাম কী, স্যারের বাসায় ফ্রিজটা যদি আপনে কিন্যা দিতেন।

কেন ? আমি কিনে দেবো কেন ?

এমনি দেবেন। আর্মি অফিসারের বাড়িত ফ্রিজ দরকার না ?

তো কী করতে হবে ? ফ্রিজ নিয়ে স্যারের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে?

না। তা না। আপনে আমাক কুড়ি হাজার টাকা দেন। আমিই ফ্রিজ কিনা পৌঁছায়া দিয়া আসবো।

না। দেবো না।

তাইলে আপনার বাড়ি-ঘর, জমি-জিরাত ?

লাগবে না। ঘুস দিয়া কেন আমি জমি ফেরত নেবো ? আমি কি চোর। টিকেট ব্লাকার। আমি হলাম অরিজিন্যাল পার্টি। জেনুইট পার্টি। ঘুস দিয়া আমি কোনো কাজ করাইও নাই। করাবোও না।

তাইলে আর কথা কী। যাই। আস্সালামু আলাইকুম।

দালালটি বিদায় নেয়। কায়সুল তার প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য লোক। মাদ্রাসার কি মোদার্রেসীন না কি আছে, তার নেতা, মাথায় টুপি। ঘাড়ে গামছা।

কায়সুল যে টাউটের পাল্লায় পড়েছিল, এই লোকটার পশ্চাদভাগ দর্শনে সে তা নিশ্চিত হয়। না। টাউট-বাটপার না। সে নিজে যাবে রংপুর মার্শাল ল' কোর্টে। দিয়ে আসবে অভিযোগনামা।

বেশ রাত পর্যন্ত জেগে অভিযোগনামা রচনা করে কায়সুল। হ্যারিকেনের চিমনি কালো হয়ে যায়। তবু ড্রাফটা মনোমতো হচ্ছে না। রেজিনা শুয়ে আছে। মশারির নিচে। ছেলেটা ঘুমের মধ্যে উঠছে কঁকিয়ে। নিচে মেঝেতে চট ও কাঁথা বিছিয়ে ঘুমোচ্ছে রুনু।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে টু দি পয়েন্ট লিখতে হবে। কোনো পয়েন্ট বাদ পড়া চলবে না। হাতের লেখাটা না হয় কাল টাইপ করে নিলেই চলবে। কলেজ ছুটির পর কেরানি সাহেবকে দিতে হবে টাইপ করতে। এসব কাজ অবশ্য মুহরিদের দিয়ে করানো ভালো। কিন্তু মুহরি, উকিল এ মার্শাল কোর্টে যে এগোতে চায় না।

সব কাজগপত্র ঠিকঠাক করে সে যায় রংপুর জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়ে। একটু ইতস্তত করে। সামনে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা প্রহরারত। সে দূরে একটু পানের দোকানে দাঁড়ায়। একটা খিলিপান কেনে। ধীরে ধীরে চিবুতে থাকে। ডান হাতের তর্জনীতে চুন নেয়। কিন্তু জিভে ছোঁয় না। পান খাওয়া পর্বটা একটু দীর্ঘমেয়াদী করা দরকার।

তার কাছে ব্যাপারটাকে তেমন ভীতিকর মনে হয় না। কলেজ রোডে এই মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটরের অফিস। বাসাটার সামনে দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে বাগান। দুটো গেট। ইন এন্ড আউট। ভেতরের বারান্দার গ্রিলে মাধবী লতার ঝাড়। লালচে ফুল আর লম্বাটে কলি বেশ সাহসের সঙ্গেই ফুটে উঠেছে।

হাতে খামটা রেডি করে সে গেট পর্যন্ত যায়। বাহুতে লাল ব্যাজ, তাতে লেখা এমপি, তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কে ?

কায়সুল নিজের পরিচয় দেয়।

কেন এসেছেন ?

এখানে কোনো অভিযোগ বাক্স নাই ? আমি একটা কপ্লেইন জমা দিতে চাই।

আছে। ওই বারান্দায়। যান। ওই কাঠের বাক্সে ফেলে দিয়ে আসেন। সেনাবাহিনীর সদস্যটি অবিকল মানুষের গলায় কথা বললে কায়সুল ভয় কাটিয়ে ওঠে।

সে বারান্দায় উঠে পড়ে। হাঁটে। নিজের পায়ের আওয়াজে নিজেই চমকে ওঠে। খামটা অভিযোগ বাক্স লেখা কাঠের বাক্সের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

তারপর সোজা হেঁটে বাইরে আসে।

কলেজ রোডের আলোয়-বাতাসে সে জোরে শ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার প্রয়াস পায়। কিন্তু সফল হয় না। একদল ছেলে, কারমাইকেল কলেজের ছাত্র হবে, সাইকেলে কলেজ যাচ্ছে। তাদের সাইকেলের ক্যারিয়ারে বই-খাতা। তারা এক সারিতে লাইন ধরেই যাচ্ছে। একজন সৈনিক বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে তাদের থামায়। সাইকেল থেকে নামতে বলে তাদের। ছাত্ররা নামে। সৈনিকটি বলে, সবাই সাইকেল ঘাড়ে তুলে এই লাইটপোস্ট থেকে ওই লাইটপোস্ট পর্যন্ত যাও।

ছেলেগুলো হতভম্ব। তারা বুঝতে পারে না কী তাদের অপরাধ ? সৈনিকটি প্রায় ধমকে ওঠে। সাইকেল ঘাড়ে তোলো। পাঁচটি তরজাতা তরুণ সাইকেল কাঁধে করে এক লাইটপোস্ট থেকে আরেক লাইটপোস্ট পর্যন্ত যায়। এপ্রিলের নিষ্ঠুরতম আকাশ, অদূরের

দোকানদার, রাস্তার রিকশাঅলা ও যাত্রী সাধারণের কাছে ছেলেগুলো তাদের লজ্জা গোপন করতে পারে না।

ইন এন্ড আউট গেটের মধ্যবর্তী জায়গায় দাঁড়িয়ে কায়সুল এই দৃশ্য দেখে। দেখে এবং বিচলিত বোধ করে। আকাশে গন গন করছে সূর্য। তার খুব বমি পায়। চিবুক শক্ত হয়ে ওঠে। কানের ভেতরটায় দপদপ শব্দ হয়। সে দৌড়ে আবার জেলা সামরিক শাসকের কার্যালয়ে প্রবেশ করে। এমপিটিকে বলে, আমার দরখাস্ত আমি ফেরত নিতে চাই। বাক্সের চাবি কার কাছে।

এমপিটি সন্দেহের চোখে তাকায়। বলে, কী হলো আপনার ?

আমি আমার অভিযোগপত্র ফেরত নেবো।

ফেরত নেবেন। তাহলে ফেলেছেন কেন ?

ফেলেছি। কিন্তু আমি ওটা ফেরত চাই।

ফেরত হবে না। এটা পালগামির জায়গা নয়। গেট আউট।

কায়সুল গেটের বাইরে যায় এবং হড়হড়িয়ে বমি করে দেয়। তাকে রাস্তার ধারে বসে পড়তে হয়।

এই ঘটনার পরেও কিন্তু কায়সুলের মনে ক্ষীণ গোপন আশা ছিল, হয়তো আর্মিদের রাইফেলের বাঁটের বাড়ি এসে পড়বে ওস্তাদ শামসুর পাছায়। আর কায়সুলের বাড়িঘর ফেরত আসবে কায়সুলেরই দখলে।

কুঞ্জকে দু'হাতে ধরে কায়সুল যখন আদর করছিল, মাথার ওপর তুলছিল আর একবার ছুড়ে ধরছিল আরেকবার, তখন তার হাসি হাসি মুখ ও ভঙ্গি দেখে রুনু (বয়স ৭) বলে, খালুজান, একটা মাত্র ঘরত তো সবার অসুবিধা। আমি বড় হয়া গেছি। এখন আপনে আর খালা যে ঘরত থাকেন, সেই ঘরত তো মোর শোতা ঠিক না। কী কন খালু।

শুনে কায়সুল হাসে। বলে কী মেয়েটা। তা ঠিক। তুই তো অনেক বড়ো হয়ে গেছিস। তোর একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত।

যা। খালুর মুখত খালি বিয়া বিয়া। খালু একটা দুই রুমআলা আসা নেন।

চিন্তা নাই রে রুনু। আমাদের ছায়াকুঞ্জই আমরা পেয়ে যাচ্ছি। দেশে মার্শাল ল' হয়েছে না। দেখবি ঠিক পেয়ে যাবো আমাদের বাড়ি। বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার আসিলে তব বধিব পরান। কী বলো আমার কুঞ্জ বাবু। চোরের দশদিন তো সাধুর একদিন। হা-হা।

কিন্তু কায়সুলের এই আশার গুড়ে বালি পড়ে। একদিন রংপুরের স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক দাবানলে দেখা যায়, আঠারো দফা বাস্তবায়ন পরিষদ শঠিবাড়ি শাখার আহ্বায়ক হিসেবে অনুমোদন পেয়েছেন ওস্তাদ শামসু মিয়া। খবরটা পড়ে কায়সুল নীরব হয়ে যায়। একদম নীরব।

কায়সুল ইসলাম চৌধুরীর ছেলে কামরুল ইসলাম চৌধুরী কুঞ্জ পড়ে ক্লাস টুতে। শঠিবাড়ি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়ে ওঠার সময় সে ফার্স্ট হয়েছে। তার রোল নম্বর হয়েছে এক। তাদের স্কুলে পাঁচ ক্লাসের জন্যে শিক্ষক আছেন তিনজন। এক শিক্ষক একই সঙ্গে দুই ক্লাসে পড়ান। এই ক্লাস ওয়ানের বাচ্চারা, তোমরা বলো, এক দশ এক এগোরো, এক দশ দুই বারো। এই সময় ক্লাস টুয়ের বাচ্চারা চুপচাপ থাকে। আবার হয়তো ক্লাস ওয়ানের ছাত্রদের বলেন, অ্যাই, তোরা অ-আ লেখ। ক্লাস টুয়ের ছাত্রদের তখন পড়াতে থাকেন— এক এক্কে এক, দুই এক্কে দুই।

ক্লাস টুতে ওঠার পর দেখা গেলো, কুঞ্জ ক্লাস টুয়ের সব পড়াই পারে। সে যখন ক্লাস ওয়ানের ক্লাস করেছে, ক্লাস টুয়ের বাচ্চাদের পড়া তার আপনা আপনিই মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন শিক্ষক তাই নামতা ইত্যাদির পড়ানোর কাজে সহযোগিতা নেন কুঞ্জের কাছ থেকে। কুঞ্জ ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, দুই এক্কে দুই। সবাই তাই শুনে বলে, দুই এক্কে দুই। দুই দুগুনে চার। সবাই তার কথার প্রতিধ্বনি করে।

ছেলেটা দেখতেও হয়েছে মায়াবী ধরনের। বাবার মতোই উজ্জ্বল চোখ, আর ভরাট গাল। কথাবার্তায় সপ্রতিভ।

বড়ো ক্লাসের ছেলেরা অবশ্য তার নামটা ধরে তাকে খেপানোর চেষ্টা করে বলে, প্রেমকুঞ্জ। এটা অবশ্য একটা বাংলা সিনেমার সংলাপ। বিটিভিতে প্রচারিত কী এক বাংলা ছবিতে এটিএম শামসুজ্জামান বার বার এই ডায়লগটি বলেন যে, এইটা কি কলেজ, নাকি প্রেমকুঞ্জ। তাই শুনে শঠিবাড়ির ইঁচড়েপাকা বালকরা এই শান্তশিষ্ট শিশুটির ওপর তাদের সমস্ত পাকামোর প্রতিভা প্রয়োগ করার সুযোগ পায়।

কুঞ্জের একটা ছোটো বোন আছে। বয়েস তিন-বছর। তার নাম ছায়া। দুটো নাম মিলে হয় ছায়াকুঞ্জ। আমাদের বাসার নাম। দুষ্ট লোকরা বাসাটা দখল করে রেখেছে। আব্বু মামলা লড়ছেন। শিগগিরই আমরা বাসাটা ফেরত পাবো। তখন আমরা ওই বাসায় গিয়ে উঠবো। কুঞ্জ কেনো কৌতূহলী তার আর তার বোনের নাম জিজ্ঞেস করলে গড়গড়িয়ে উত্তর দেয়।

কুঞ্জর নাকের নিচে সারাক্ষণই সর্দি ঝুলে থাকে। এ বিষয়ে তাকে বলা হলে সে জবাব দেয়, ব্যাঙের সর্দি হয় না, সর্দি মানুষেরই হয়। এ জবাবটা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে তার আব্বু।

কুঞ্জর সেদিন ছিল এনুয়াল পরীক্ষার শেষ দিন। এদিনে তাদের বিষয় ছিল ছবি আঁকা। আব্বু বললেন, ছবি আঁকার পরীক্ষা না দিলেও কোনো ক্ষতি নেই। তুমি যদি পরীক্ষা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারো, তাহলে তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবো।

কোথায় আব্বু ?

রংপুরে। আজ আমাদের জমির মামলার রায় হবে। উকিলরা আশা করছেন, রায় আমাদের পক্ষেই যাবে। তুমি কি আমার সঙ্গে রংপুর যেতে চাও? কুঞ্জ আগ্রহ দেখায়।

বাপে ছেলে মিলে রংপুর যায় তারা। কুঞ্জর কাছে কিন্তু রংপুর আর মামলা আর তারিখ পড়া কথাটা খুব পরিচিত। তার সাত বছরের জীবনে এই কথা সে বহুবার শুনেছে। তার আব্বু প্রায়ই রংপুর যান। মামলার তারিখ থাকে। হয়তো তার না গেলেও চলে। কিন্তু উৎসাহ-উত্তেজনা ও উদ্বেগের কারণে তিনি না গিয়ে পারেন না।

কায়সুল আদালত কক্ষের বেঞ্চিতে বসে এ কথাই ভাবছিল। আজ ৮ বছর ধরে সে মামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কতো ঝড়-ঝাপ্টা, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এসেছে আজকের দিনটি। ইতিমধ্যে এডভোকেট আজিজার রহমান মারা গেছেন। গোলাপ উকিল নিজেই সিনিয়র উকিলে পরিণত হয়েছেন এবং এই মামলাটা এখনো তিনিই পরিচালনা করছেন। কায়সুলের চুল প্রায় সবই পেকে গেছে। সেটা অবশ্য তার বংশের দোষ। তার মায়েরও সব চুল অল্প বয়েসেই পেকে গিয়েছিল। গোলাপ উকিলের মাথায় বিরাট একটা টাক পড়ে গেছে। যেটা আগে ছিল না।

ডিসেম্বর মাস। বেশ শীত পড়েছে। রংপুরে গত তিন দিন ধরে আকাশে সূর্য দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার মতো ম্লান হয়ে আছে সমস্তটা দিন।

এই ৭/৮ বছরে কতো কিছু ঘটলো। ভালোমতো কি কায়সুলেরই সব খেয়াল আছে। বিবাদী পক্ষ একবার কোর্টে তাদের জবাব দিয়ে যায়। তার কয়েকদিন পরে তারা অ্যামেনমেন্ট পিটিশন করে। অর্থাৎ, তারা যে জবাব দিয়েছে, সেটার সংশোধনী দিতে চায়। তখন মামলা ঘুরতে থাকে, পেঁচাতে থাকে এই প্রশ্নে যে, অ্যামেনমেন্ট পিটিশন গ্রহণ করা হবে কি হবে না। সেটার ওপরেও শুনানি হয়। এই অ্যামেনমেন্ট পিটিশনের ব্যাপারটা ফয়সালা হওয়ার জন্য যায় হাইকোর্টে। সেখানে পড়ে থাকে বছরের পর বছর। তারপর হাইকোর্ট এই ব্যাপারটার ওপর রায় দেয়। তাদের সংশোধনী গৃহীত হয়। আবার বিচার শুরু হয় প্রথম থেকে। আর্গুমেন্ট চলে। এতোটা বছর এতো কিছু হওয়ার পর আজ মুন্সেফ কোর্ট রায় দিতে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে পুরোনো মুন্সেফ সাহেব বদলি হয়েছেন। এসেছেন নতুন মুন্সেফ। ভাগ্যিস প্রবাদ ছিলো, হাকিম নড়ে কিন্তু হুকুম নড়ে না।

বিচারক একটু পর আদালতে আসবেন। কায়সুল খুব টেনশন বোধ করে।

এরই মধ্যে কুঞ্জ বলে, আব্বু পেসাব করবো।

যাও। বাইরে থেকে করে আসো।

কুঞ্জ ওঠে। একা একা বাইরে যায়। এদিক-ওদিক তাকায়। লোকজন কোথাও পেসাব

করছে কিনা পর্যবেক্ষণ করে। কাউকে পেসাব করা অবস্থায় দেখতে পায় না সে। তবে একজনকে কুলুপ করতে দেখা যায়। কুঞ্জ সেদিকটায় যায়। একটা দেওয়ালের পাশে বসে পড়ে। হাফ প্যান্টের একপা সরিয়ে জলবিয়োগ করতে তার মোটেও অসুবিধা হয় না।

বিচারক আদালত কক্ষে প্রবেশ করেন। সবাই চুপ করে যায়। এতো চুপচাপ যে, বাইরে একটা ফেরিওয়ালার 'চাই বাদাম' ডাকও স্পষ্ট শোনা যায়। আর শোনা যায়, কায়সুলের বুকের ধুকপুক শব্দ।

কুঞ্জ পেসাব সেরে এসে বাবার পাশে বসে পড়ে। লাল রঙের কাপড়ে ঢাকা বিচারকের বড়ো টেবিল, পুরনো কাঠের কাঠগড়া, অতি পুরাতন ফ্যান— এসব কিছুর দিকেই কুঞ্জর নজর যায়।

অবশেষে মাননীয় আদালত রায় ঘোষণা করেন। মিঠাপুকুর থানার শঠিবাড়িস্থ রঘুনাথপুর মৌজার অমুক দাগের ভূমি এবং তার ওপর সকল স্থাপনা ও গাছ-গাছালি ক্রয় ও নির্মাণ সূত্রে কায়সুল ইসলাম চৌধুরী পিতা মরহুম রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর।

রায় শোনার সঙ্গে সঙ্গে কায়সুল হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। সে যে গোলাপ উকিলকে কী বলে ধন্যবাদ দেবে বুঝতে পারে না। বাবাকে কাঁদতে দেখে কুঞ্জও কাঁদতে শুরু করে। মাননীয় বিচারক আদালত কক্ষ থেকে চলে যাবার পর সবাই ঘিরে ধরে কায়সুলকে। চাচা বখশিশ দ্যান। গোলাপ উকিল সকলকে নিরস্ত করেন, বলেন, সরো তো বাহে, কেবলতো গেলো মুন্সেফ কোর্ট, ওরা কি আপিল করবে না।

ফেরার সময় বাসে কুঞ্জ জিজ্ঞেস করে বাবাকে, আব্বু, খুশির খবর শুনে তুমি কাঁদছিলে কেন ?

কায়সুল বলে, খুব খুশির খবর শুনলে কান্না আসতে পারে বাবা। কান্না তো দুই প্রকার। আনন্দের কান্না আর দুঃখের কান্না। তারপর আপন মনেই বলে, এই জমি– এই বাড়ি আমার জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে বাবা। এখন ভাড়ার বাসায় কতো কষ্ট করে থাকি। তার ওপর আবার মাস শেষে ভাড়া গুনতে হয়। বেসরকারি কলেজ কয় টাকাই বা বেতন। তার ওপর এই মামলার পেছনে কতো খরচ। কতোবার কতো জায়গায় যেতে হলো, ধর্না দিতে হলো। শুধু জুতার তলার খরচটা বাঁচাতে পারলেই তো আমরা আজ বড়ো লোক হয়ে যেতাম।

আব্বু। আমরা কি গরিব ?

বাবারে। তুই একটা শার্ট একটা প্যান্ট পরে রোজ স্কুলে যাস। প্যান্টের বোতাম নেই, নলা বের হয়ে আছে। শার্টের পকেটটা ছিল, এখন নেই, এখানকার রঙের পার্থক্যই সেটা বলে দিচ্ছে। স্পন্স পরে স্কুলে যাস। যেদিন স্পন্স ছিঁড়ে যায়, সেদিন যাস খালি পায়ে।

না আব্বু। স্পন্স ছিঁড়ে গেলে আমি নিজেই সারিয়ে নিতে পারি।

হ্যাঁ পারিস। কিন্তু যদি আমার জমিটা বেদখল হয়ে না যেতো, এইভাবে আমাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে না হতো, তাহলে তোর পায়ে থাকতো জুতা-মোজা।

তাহলে আজ থেকে তো আমরা বড়োলোক।

হ্যাঁ। তা বড়োলোক। এই জমির দাম এখন অনেক বেশি। ঘরদোরের কথা না হয় নাই হিসাব করলাম।

আদালতের রায় শুনে রেজিনা খুশি, এমনকি ছায়াও খুশি। রেজিনা নফল নামাজ পড়তে বসে। কায়সুলের মনে পড়ে যায়, কেরামতিয়া মসজিদে একবার যাওয়া উচিত।

রায়ের কপি তোলা, উচ্ছেদের ডিক্রি জারি করার জন্যে আর মামলার রায় এক্সিকিউশনের জন্যে আবার মামলা করতে হবে কিনা এসব নিয়ে কায়সুল ব্যস্ত হয়ে যায় ফের। গোলাপ উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে রংপুর যায় পরপর তিনদিন।

ইতিমধ্যে— সত্যের জয় হয়েছে— এটা সবাইকে জানানোটা কায়সুল নিজের কর্তব্য বলে বোধ করে। সে দৈনিক দাবানল পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেয় এই মর্মে যে– সত্যের জয় অনিবার্য। শঠিবাড়ির ছায়াকুঞ্জ বাড়ি ও জমির ঐতিহাসিক মামলার রায় অবশেষে বেরিয়েছে। মাননীয় আদালত জমির একমাত্র বৈধ মালিক বলে কায়সুল ইসলাম চৌধুরীর পক্ষে রায় দিয়েছেন।

এসব উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে যখন কায়সুল ব্যস্ত, তখন আসে উচ্চ আদালতের নির্দেশ। ওস্তাদ শামসু গং জজকোর্টে আপিল করেছে।

কায়সুলের ফোলানো বেলুনটা চুপসে যায়।

আবার শুরু হয় এই একটা ব্যাপার নিয়েই পথে পথে ঘোরা। মাথা কুটে মরা।

কামরুল ইসলাম চৌধুরী কুঞ্জ এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে মিঠাপুকুর হাই স্কুল থেকে। ভালো ছাত্র, ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। ফলে তার পড়ার খরচ লাগে না, বরং বৃত্তির টাকাটা সংসারের উঞ্ছবৃত্তির কাজে লাগে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে কায়সুল টের পায়, কুঞ্জর ঘরে আলো জ্বলছে। বৈদ্যুতিক বাতি, ইতিমধ্যে তাদের কাঁচা ঘরেই বিদ্যুৎ এসে গেছে। ছেলে বড়ো হয়েছে, তার জন্যে আলাদা ঘর দরকার। বাড়িওয়ালা একটা ছাপড়া তুলে দিয়েছে। ওখানেই কুঞ্জ থাকে এবং পড়াশুনা করে।

কায়সুল আর কুঞ্জর পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটায় না। আজ পরীক্ষা আছে দুটো। ইংরেজি প্রথমপত্র আর দ্বিতীয়পত্র। ছেলেটা পড়ছে, পড়ুক। একটু পর, ৮টার দিকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাপ-বেটা মিলে পরীক্ষার হল পর্যন্ত যাবে।

সব হারিয়ে কায়সুলের বড়ো ভরসা তার এই ছেলেটা। কুঞ্জ যদি পড়াশুনা করে মানুষ হয়, তাহলে হয়তো তার আর তার পরিবারের কষ্ট কিছুটা সার্থকতার মুখ দেবে।

কায়সুল মর্নিং ওয়ার্কে বের হয়ে এইসব সাতপাঁচ ভাবে। এবার এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে মার্চ মাসে। একটা আমগাছের নিচে যেতে যেতে কায়সুল গাছের নিচে তাকায়, আমের মোল ধরেছে। মাটিতেও ঝরে পড়া মোল, গুঁড়ি গুঁড়ি। মাছিরা ভন ভন করছে। রাস্তার দু'ধারে চষা ক্ষেত। কোনো কোনো ক্ষেতে ছোটো ছোটো পাট, কোনো কোনো ক্ষেতে আউশ কিংবা ইরি।

শঠিবাড়িটাই কতো বদলে গেলো। কতো নিত্য নতুন বাড়ি। কতো নিত্য নতুন ব্যবসা। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যবসা দাঁড়িয়েছে ফেনসিডিলের। তার কলেজের কতো ছাত্রই দিন-রাত্রি ফেনসিডিল খাচ্ছে।

কায়সুলের ভয় হয়। বুকের মধ্যে ছোট্ট ধাক্কা লাগে। ছেলেটাকে এই সবের হাত থেকে সে কীভাবে বাঁচাবে? নগর পুড়ে গেলে দেবালয় কি এড়ায় ?

এদিকে মেয়েটা বড়ো হচ্ছে। ছায়া। ক্লাস সেভেনে পড়ে। শঠিবাড়িতেই পড়ে। মাথায়-বুকে ওড়না পেচিয়ে স্কার্ফ জড়িয়ে স্কুলে যায়। কবে যে কী ঘটে যায়। দেশে তো বিচার-আচার নেই। যে কেউ যে কোনো কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

মেয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসেছে। জোরে জোরে পড়ছে, সুর করে। আলোচ্য অংশটুকু কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত...। মৌমাছির গুঞ্জনের মতোই লাগে মেয়েটার পড়া।

গরম ভাত খেয়ে বাপ-ছেলের বেরিয়ে পড়তে পড়তে নয়টা বাজে। অসুবিধা নেই। এখনো একঘন্টা হাতে আছে।

তারা হাঁটে। কিছু দূর হেঁটে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে তারা বাসে উঠবে। বাস না পাওয়া গেলে ইদানীং টেম্পো হয়েছে, তাতেও ওটা যায়। না হলে রিকশা তো আছেই।

ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা সকাল বেলায়। পরীক্ষা হলের চারদিকে ভিড়। এতো ভিড় যেন হাট লেগে গেছে। হলের সিটে কুঞ্জকে বসিয়ে রেখে কায়সুল বাইরে এসে দাঁড়ায়। কতোগুলো লিচু গাছ আছে এই সেন্টারের বাইরে। একটা গাছের নিচে সে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। পিঁপড়া আছে নাকি, মাটিতে আর গাছের গায়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে। বেশ চড়া রোদ উঠেছে। বাইরে কয়েকজন পুলিশ বেঞ্চে বসে রোদের মধ্যেই ঝিমুচ্ছে।

এতো ভিড় কেন পরীক্ষার হলের চারদিকে? কায়সুলের অসহ্য লাগে। ওই যে দুটো ওষুধের দোকানে দুটো ফটো কপিয়ার মেশিন। আরো দুটো ফটো কপিয়ার মেশিন এসে গেলো। রিকশা থেকে নামিয়ে ওই আমগাছ তলায় বসানো হচ্ছে। ব্যাপার কী?

পানঅলা, সিঙ্গারাঅলা, চানাচুরঅলা, কার্বন পেপারঅলা, কাগজঅলা— এটা কি বাজার নাকি! ঢং ঢং ঢং। পরীক্ষা হলের ঘন্টা বাজে। প্রশ্নপত্র এখন দিয়ে দেওয়া হবে। দেওয়া হবে কি হয়ে গেছে। ওই তো ফটো কপিয়ারের দোকান ফটো কপি হচ্ছে। প্রতিপ্রশ্ন ৫ টাকা। অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্নও এসে গেছে। হৈ হৈ রৈ রৈ ভাব। ও, তাহলে এরা সব নকল সরবরাহকারী। নোট বই ছেঁড়ো রে। এই, এই প্রশ্নটার উত্তর লেখ। কপি কর কপি

কর। ওই হারামজাদা, ফটোকপি করে নে। প্রতি পাতা ফটোকপি দুই টাকা দুই টাকা। নে-নে। দৌড় ধর। সব সাপ্লায়ার দৌড়ে উঠে পড়ে বারান্দায়। জানালা দিয়ে নকল দেয়। দরজা দিয়ে দেয়। কী মোচ্ছব চলছে এখানে। ওই যে ওখানে অবজেকটিভ টাইপের উত্তরপত্রই চলে এসেছে। টিক দ্যাও। টিক দ্যাও। একজন পণ্ডিত ব্যক্তিও এসেছেন। উনি হচ্ছেন অবজেকটিভ টাইপের বিশেষজ্ঞ। ক সেট, খ সেট, গ সেট— সবকটাতেই উনি ধামাধাম টিক দিয়ে দিলেন।

কায়সুলের মাথায় রোদ চড় চড় করে। এসব কী হচ্ছে! তাহলে তার ছেলেটা পড়াশুনা করে করলোটা কী। এই হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে সে পরীক্ষা দেবে কীভাবে। কীভাবে সে ভালো রেজাল্ট করবে।

কায়সুল দৌড়ে হেডমাস্টারের রুমে যায়। হেডমাস্টার সাব, এসব কী হচ্ছে ? এতো নকলের ছড়াছড়ি কেন ?

হেডমাস্টার এমনভাবে তাকান— যেন ভারি অদ্ভুত উদ্ভট কথা শুনলেন।

বলেন, বাইরে থেকে নকল সাপ্লাই দিলে আমরা কী করবো ? ভেতরটা আমরা সামলাচ্ছি। পুলিশ তো কিছু করছে না।

রাগে দপদপ করে কায়সুলের মাথার রগ। সে বারান্দায় উঠে চিৎকার করে, খবরদার, খবরদার কেউ নকল সাপ্লাই দিতে পারবা না। খবরদার।

নকল সাপ্লায়াররা প্রথমে ভয় পেয়ে যায়। তারা বারান্দা ছাড়ে। পরে শুরু হয় ফিসফিসানি। লোকটা কেরে। এভাবে চিৎকার-চেঁচামেচি করে। একজন বলে, ওতো এখানকার ইনভিজিলেটর না। দে ওরে ধোলাই দে।

কতোগুলো মুরব্বি লোক এগিয়ে আসে। ও প্রফেসর সাহেব। এদিকে আসেন। আপনার তো ডিউটি না। আপনে চিল্লাচিল্লি করেন ক্যান ?

করবো না। নকল হবে কেন? নকল করে পরীক্ষা দিয়ে কী লাভ? এডুকেশনের লক্ষ্য তো পাস করা না...।

কে রে লেকচার দেয়। এটা ক্লাসরুম না। ধরতো ব্যাটাক। কতোগুলো তরুণ এগিয়ে আসে। তারা পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় কায়সুলকে। স্কুলের পেছনে বিরাট পুকুর। পুকুরে টলমল করছে জল। কায়সুলকে সোজা ছুড়ে মারে পানিতে। কায়সুল সাঁতার জানে। সুতরাং উঠে আসতে তার অসুবিধা হয় না। কিন্তু আকাশে গন গন করে সূর্য, আকাশ নীল, পানিতে কাপড়-চোপড় সব ভেজা, পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কতোগুলো মানুষ, দাঁত বের করে হাসছে সব... কায়সুলের মাথা হেঁট হয়ে আসে। অক্ষমতার ক্রোধে মনে হয় নিজের হাত নিজেই খেয়ে ফেলে সে।

সন্ধ্যার সময় পরীক্ষা দিয়ে ফিরে আসে কুঞ্জ। তাকে ক্লান্ত দেখায়। সে সোজা যায় মায়ের কাছে। মায়ের আলসারের ব্যথা। মা শুয়ে আছে বিছানায়। রান্নাঘরে কাজ করছে ছায়া।

আম্মু, আব্বু কোথায় ?

ক্যান ? দ্যাখ কোথায় ?

কায়সুল এমন সময় ঘরে ঢোকে। সে সারাদিন ঘুরেছে বাইরে বাইরে। পরনের ভেজা কাপড়-চোপড় শুকিয়েছে পথের রোদে আর বাতাসে।

আব্বু, আজ কী হয়েছে সেন্টারে ?

কিছু না বাবা। খুব নকল হচ্ছিল বলে আমি চিৎকার-চেঁচামেচি করেছি। প্রতিবাদ তো হওয়া উচিত।

আব্বু আমি সব শুনেছি। সব। ছেলে কেঁদে ফেলে।

রেজিনা অসুখে-বিসুখে প্রায় লেপ্টে আছে বিছানায়, বলে, কী হইছে? ঘটনাটা কী ঘটেছে? কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেয় না। ছেলে কাঁদতেই থাকে।

এই জন্যে আমি বলেছিলাম, আমাকে ক্যাডেট কলেজে দাও। কেন দাওনি তখন ?

কায়সুল জবাব দেয় না। জবাব একটা যদিও তার জানা আছে, কিন্তু সেটা বলা যাবে না ছেলেকে।

বিছানায় শুয়ে আছে কায়সুল। ঘর অন্ধকার। জানালা খোলা। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা চাঁদ। পাশে ঘুমুচ্ছে আর ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে কঁকিয়ে উঠছে রেজিনা। তার মুখে এসে পড়েছে এক ফালি চাঁদের আলো। চাঁদের মুখে যেমন আছে এবড়ো থেবড়ো দাগ, মেছতা পড়ে রেজিনার মুখটাও তেমনি হয়ে গেছে। তার ওপর পেটে আলসারের ব্যথা। যখন ব্যথা তীব্র ওঠে, তখন মুখখানা তার নীল হয়ে যায়। ওপাশে মশারি টাঙ্গিয়ে শুয়ে আছে ছায়া। তার মেয়েটা। পর্দা করার জন্যে মশারির এ পাশে টাঙিয়ে দিয়েছে মায়ের শাড়ি। মেয়ে বড়ো হয়েছে, সব কিছু বোঝে।

ছেলেটাও বড়ো হয়েছে। এখন সে বহু প্রশ্নের জবাব জানতে চায়।

বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকা একটানা ডেকে চলে। দূর থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক আর কুকুরের প্রতিবাদ। বড়ো রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে নাইট কোচ, দূরে কোথায়। রাতের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে সেই শো শো আওয়াজ বুকের ভেতরটা শূন্য করে দিয়ে যায়।

আজ ছেলে জানতে চেয়েছে, তাকে ক্যাডেট কলেজে কেন দেওয়া হলো না। জবাবটা তাকে কায়সুল ইচ্ছে করেই দেয়নি।

খুব ছোট্ট সহজ জবাব। কারণ কায়সুলের আর্থিক সঙ্গতি নেই। বেসরকারি কলেজের সহকারি অধ্যাপক সে। নামেই অধ্যাপক। বেতন নিয়মিত পাওয়া যায় না। জমানো টাকা

একটাও নেই। একমাত্র আশা ভরসা তার ছায়াকুঞ্জটা যদি ফিরে পাওয়া যায়। জমিজমা ঘরদোর মিলে এই বাজারে অনেক টাকা। তখন বাসা ভাড়াটাও আর লাগবে না। এই ভরসা এখন পরিণত হয়েছে সোনার হরিণে। তার পিছে ছুটতে গিয়ে কায়সুল এখন সর্বস্বান্ত। মামলা চালানোর খরচ আছে না? এ যে ফুটো বালতি। যতোই পানি ঢালো না কেন, পানি জমে থাকে না।

কতো বছর হয়ে গেলো। তার জমির মামলাটা আর শেষ হলো না। জজকোর্ট থেকে মামলা গেছে হাইকোর্টে, আপিলেড ডিভিশনে। কোনোই অগ্রগতি নেই মামলার।

আজ আঠারোটি বছর। আঠারো বছর ধরে সে এই মামলা লড়ে চলেছে।

রেজিনার চিকিৎসা করা দরকার ভালোমতো। রংপুর মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করালে ভালো হতো। শঠিবাড়ির ডাক্তার বলেছে অপারেশন লাগবে। হাতে একটা টাকা নেই। অপারেশন করতে টাকা লাগবে না ? রেজিনার গয়নাগাটি যা ছিল সব বিক্রি করা হয়ে গেছে। এখানে ওখানে ধারকর্জও কম হয় নাই!

সেদিন ছায়া এসেছে কাঁদতে কাঁদতে। স্কুল থেকে ফেরার পথে কারা যেন তাকে কী বলেছে। কায়সুলের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে রক্ত চড়ে যায়। তক্ষুণি সে বেরিয়ে পড়তে চায় ছুরি হাতে। রেজিনা পায়ে ধরে তাকে নিবৃত্ত করেছে। ১৮ বছর আগে একদিন একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাদের এই দুর্দশা। আজ আরেকটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে না জানি কী হয়। হয় অন্যকে খুন করবা, নাইলে নিজে মরবা। আমাদের কী হবে ?

কথা তো ঠিক! কিন্তু ঠিকও নয়। ন্যায় অন্যায় নিয়েই আমাদের পৃথিবী। অন্যায় চিরকালই ছিল। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ছিল। তোমাকে মানুষ পুকুরে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু তোমার যদি হাত-পা খোলা থকে, তুমি সাঁতার কাটতে পারো। কিন্তু যদি বলা হয়, ডুবন্ত অবস্থাতেও তুমি হাত-পা ছুড়তে পারবে না, তোমার ডুবে যাওয়ার প্রক্রিয়া তোমার নিজেকে মেনে নিতে হবে— তার চেয়ে গ্লানিময় জীবন আর কী হতে পারে।

গ্লানি! গ্লানি! এই জীবনটা এখন গ্লানিতে ছেয়ে গেছে। শঠিবাড়ি কলেজ থেকে অন্য কোনো কলেজে যাওয়ার কোনো চেষ্টা কায়সুল কোনোদিন করেনি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলেছে, শঠিবাড়িতে আমার ঘরদোর, জমি-জমা— এখান থেকে আমি কই যাবো! আর তাছাড়া মামলা মোকদ্দমার একটা ঘোরও সব সময় ছিল তার মাথার ভেতরে!

সম্প্রতি কলেজে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছে। কয়েক মাস বেতন-ভাতা সব বন্ধ ছিল। খুব অভাব। কলেজ উঠে যায় উঠে যায় এমন অবস্থা।

এখন অবস্থা ভালো। স্থানীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। তিনি প্রভাব খাটিয়ে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করে দেবেন। নগদ টাকাও তিনি ডোনেট করছেন কলেজে।

এই গণ্যমান্য ব্যক্তিটির নাম ওস্তাদ শামসু মিয়া। তারপর থেকে কায়সুল আর কলেজে যায় না। সারাটা দুপুর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। গাইবান্ধার কিশোর লাইব্রেরীতে গিয়েছিল একবার— নোটবই লেখা যায় কি-না, খোঁজ নিতে।

কিন্তু অভাব চারদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। ধারকর্জ করারও আর জায়গা নেই। বাজারের দোকানে দোকানে তার বাকি মেলা।

খবর পাওয়া গেছে, কলেজের একাউন্টে টাকা চলে এসেছে। এরিয়ার বিল সমেত টাকাটা তুলে ফেলা যায়। তাহলে কি কাল একবার কলেজে যাবে কায়সুল ? টাকাটা তুলে নেবে? টাকার গায়ে তো ওস্তাদ শামসুর নাম লেখা থাকে না। যাবে নাকি ?

আকাশের দিকে তাকায়। চাঁদটাকে আর দেখা যায় না। কী চাঁদ ছিল এটা। পঞ্চমীর চাঁদ। ডুবে গেলো। তার মনে পড়ে জীবনানন্দের একটা কবিতা। আট বছর আগের একদিন। ছাত্রজীবনে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক সপ্তাহে সে এই কবিতাটা আবৃত্তি করেছিল।

কাল রাতে— ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ

মরিবার হল তার সাধ।

কায়সুলের নিজেকে বড়ো ক্লান্ত লাগে। কিছুদিন পরে তার মামলার চূড়ান্ত রায় হবে। এই রায় যদি তার পক্ষে না যায়! তাহলে এই অপমানের এই পরাজয়ের মুখোমুখি কি তার হওয়া উচিত ? আর যদি পক্ষে যায়— এটা দেখার জন্যে তার ছেলে আছে, মেয়ে আছে। বউ আছে।

আজ সকালে ছেলেগুলো তাকে পুকুরের পানিতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। তার নিজের ছেলের বয়সী একদল তরুণ।

বাইরে একটা বিড়াল কাঁদছে। হুবহু মানব শিশুর মতো কান্না তার।

কায়সুল উঠে পড়ে। তাকে মনে হয় চাঁদে পেয়েছে। মন্ত্রতাড়িতের মতো সে নিঃশব্দে তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। চাঁদের মতো মেছতা পড়া মুখ।

পাশের বিছানায় মেয়েটি। মশারির নিচে। অন্ধকারে দেখা যায় না।

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে— শিশুটিও ছিলো;

প্রেম ছিলো, আশা ছিলো— জ্যোৎস্নায় তবু সে দেখিল

কোন ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার ?

চুপচাপ করে চলাচল করে কায়সুল। যেন কেউ টের না পায়। বাইরে কাপড় নেড়ে দেওয়ার জন্যে একটা নতুন নাইলনের দড়ি টাঙানো আছে। বেশ মোটা। এতো মোটা কেন কিনেছিল কায়সুল? যেন তার ওজন দড়িটা বইতে পারে?

দড়িটা হাতে নিয়ে ঘন অন্ধকার পথ বেয়ে কায়সুল হাঁটতে থাকে।

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে

একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;

যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের— মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা এই জেনে।

বাইরে এ-বাসা ও-বাসার বারান্দায় বাতি জ্বলছে। ফলে অন্ধকারেও পথ চিনে নেওয়া যাচ্ছে। কায়সুল হাঁটে। তার ছায়াকুঞ্জের বাড়িটার দিকে যায়। কতোগুলো কুকুর তাকে দেখে তেড়ে আসে। কায়সুল ভয় পায় না।

বাড়িটা অনেক বদলে গেছে। অনেক পুরনো হয়ে গেছে। দরজাগুলোয় ঘুণ ধরেছে মনে হয়। হারামজাদা কবাট-টবাটগুলো বদলে দিতে পারতো না। বাইরের প্রাঙ্গণে কাঁঠাল গাছটা আজো আছে। তার ডালটা শক্ত সমর্থই মনে হয়।

কাঁঠাল গাছটায় এঁচোড় ধরেছে। দূরের একটা বাসা থেকে আসা ইলেট্রিক আলোয় কায়সুল টের পায়। সে এঁচোড়গুলো হাত দিয়ে নাড়ে।

ছায়াকুঞ্জ সাইনবোর্ডটা আছে। অবশ্য রং জ্বলে গেছে। ভালোমতো পড়াও যায় না।

কাঠালের ডালের নিচে কতোগুলো ইট, সে পালা করে উঠে দাঁড়ায়। দড়িটা ছুড়ে মেরে ডালের ওপর দিয়ে পার করতে পারে। ভালো করে গিঁট্টু বাঁধে। হ্যাঁ। বাঁধা হয়েছে। এবার সে ফাঁস তৈরি করে।

অশ্বত্থের শাখা নয়, কাঁঠাল গাছের শাখা প্রতিবাদ করে, কেননা তার মনে হয় যে, কামরুল ইসলাম চৌধুরী কুঞ্জর মুখটা শেষবারের মতো দেখা হলো না।

কিন্তু সে ইটের পালায় উঠে দাঁড়ায়। ফাঁসের মধ্যে গলা ঢুকিয়ে দেয়। পা দিয়ে ইটটা সরিয়ে দিতে হবে।

জোনাকির ভিড় দূর জঙ্গলে। তারা সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে মাখামাখি করে। কায়সুলের দূর শৈশবের কথা অকারণে মনে পড়ে। মনে পড়ে একদিন তাদের একটা হাঁস নদীতে প্রবল বানের তোড়ে ভেসে ভাটির দিকে চলে যাচ্ছিল। সে ডাকছিল তই তই তই তই, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও হাঁসটা তীরে আসতে পারছিল না, হাঁসটার সঙ্গে সঙ্গে বালক কায়সুলও চলে যাচ্ছিল ভাটির দিকে, তখন তার বাবা তাকে ডাকছিল— কায়সুল, কায়সুল, তারপর কোথা থেকে জজ সাহেবের হাতে হাতুড়ি বাজে, লাল কাপড় ঘেরা টেবিল, পেশকারদের পেশ করার ভঙ্গি, আর্দালির চিৎকার, কায়সুল ইসলাম চৌধুরী হাজির, হাজির... জীবনের এই স্বাদ, সুপক্ব যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের– তোমার অসহ্য বোধ হল—

কায়সুলের পা নড়ে, পায়ের নিচ থেকে ইট সরে যেতে থাকে, পৃথিবী সরে যেতে থাকে, কুঞ্জ কুঞ্জ বলে একটা আওয়াজ তারা ঠোঁট থেকে বেরুবে বলে ফুস ফুস থেকে বেরিয়ে গলায় আটকে যায়, কিন্তু মনের মধ্যে এই প্রবল সান্ত্বনা তাকে প্রবোধ দেয় যে, জীবনের শেষ দিনটিতে ছায়াকুঞ্জের দখল সে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

পায়ের নিচে কোনো ইট নেই, পৃথিবী নেই, শুধুই শূন্যতা।